

ইসলামী আন্দোলনে ব্রাহ্ম

ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ

ইসলামী আন্দোলনে ভ্রাতৃত্ব

ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ

এম.এ.(বাংলা), পিএইচ.ডি.(রাজ.)



শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

ড. এ এস এম আজিজুল্লাহ

প্রকাশনায় :

শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী

নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী ।

02996-864086

এসবিএ-২

প্রকাশকাল :

জানুয়ারী ২০১১

মাঘ ১৪১৮

ছফর ১৪৩৩

প্রশ্নসমূহ :

সর্বস্বত্ত্ব লেখকের

অক্ষর বিন্যাস :

এস. আহমাদ কম্পিউটার্স

৭৭/১৭, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

প্রচ্ছদ :

আল-মারুফ, সুপারকম রিলেশন

গোরহাঙ্গা, রাজশাহী ।

ସୁଦ୍ରଂ ଓ ବାଂଧାହି :

দি বেঙ্গল প্রেস

রাণীবাজার, রাজশাহী ।

মূল্য : ৭০ (সত্তর) টাকা মাত্র।

ISLAMI ANDOLONE VRATRITWA (Brotherhood in Islamic Movement) Written by **Dr. A S M Azizullah**. 1st Edition : January 2011. Published by Shamolbangla Academy, Rajshahi, Bangladesh. Price Tk. 70/- (Sevety). US \$ 5 (five) Only.

ISBN : 978-984-33-2355-2

প্রকাশকের নিবেদন

ইসলাম বিশ্ব মানবতার মুক্তির সনদ। ইসলামবিদ্বেষী অপশক্তিগুলো উদ্দেশ্যমূলক ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েও বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ঠেকাতে চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু অজ্ঞতাবসে অনেক মুসলমানই ইহুদী-খৃষ্টানদের পাতানো ফাঁদে পা দিয়ে আপন ধর্ম সম্পর্কে মিথ্যা সংশয় ও সন্দেহে হাবুডুবু খাচ্ছে। অথচ মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সমাজের সর্বস্তরে অহির বিধান প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বিশ্বের সর্বনিকৃষ্ট বর্বর জাহেলী সমাজের অসভ্য মানুষগুলোকে সোনার মানুষে পরিণত করে প্রমাণ করে গেছেন, পৃথিবীতে কাজিত শান্তির নিশ্চয়তা দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। মূলতঃ তিনি ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক তথা জীবনের সকল দিক ও বিভাগে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুপম আদর্শ স্থাপন করে গেছেন।

মানুষ আশরাফুল মাখলুকাৎ। কালের বিবর্তনে আপসে নানা বিভাজন সৃষ্টি করে সেই শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি ক্ষেত্রবিশেষে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট প্রাণীতে পরিণত হয়ে গেছে। আবহমান কাল থেকেই ধনী-গরীবের অবাস্থিত ব্যবধান, সাদা-কালোর মিথ্যা অহঙ্কার, গোত্রে গোত্রে যুগের পর যুগ ধরে যুদ্ধ, ধর্মের নামে কাটাকাটি প্রভৃতি ঘণ্য ঘটনা এই পৃথিবী মনুষ্য বসবাসের অনুপযোগী করে তুলেছিল। এহেন নায়ুক পরিস্থিতিতে সাম্য ও মৈত্রীর মহান বার্তা নিয়ে ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হন বিশ্ব মানবতার মুক্তি আন্দোলনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)। যিনি অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে জাহেলী সমাজকে শান্তির সমাজে পরিণত করে জাতির সামনে রেখে গেছেন এক চূড়ান্ত অনুসরণীয় আদর্শ।

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার অন্যতম পন্থা হল জাতি, ধর্ম বা বর্ণ পরিচয়ের উর্ধ্বে উঠে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মোচ ঘটানো। অত্র গ্রন্থে সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গী সবিস্তর আলোচিত হয়েছে। ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য, ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায় ও ভ্রাতৃত্ব নষ্টের কারণ ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ছিটেফোঁটা কিছু চালচিত্র এতে স্থান পেয়েছে। সাথে সাথে ইসলামের স্বর্ণযুগের কিছু সোনার মানুষের ভ্রাতৃত্ববোধের দু'একটি অতুলনীয় ও অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা হয়েছে। মোটকথা গ্রন্থটি ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মী তথা একজন মানুষের সাথে আরেক জন মানুষের পারস্পরিক ব্যবহারিক সম্পর্কের একটি আলেখ্য।

অজ্ঞ মুসলিম সমাজসহ যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম এবং মুসলমান জাতিকে সাম্প্রদায়িক জাতি মনে করেন, তাদের জন্যও এ গ্রন্থ উপকারে আসবে বলে আশা করি।

সূচিপত্র

□ ভূমিকা	৬
□ ইসলামী আন্দোলনে ভ্রাতৃত্ব	৯
□ ভ্রাতৃত্বের প্রকারভেদ	১৪-৩৬
জন্মগত ভ্রাতৃত্ব	১৪
জাতিগত বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব	১৪
হিন্দু ধর্মে পারস্পরিক সম্পর্ক	১৫
ইহুদী-খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক	১৬
বিশ্বভ্রাতৃত্বে ইসলাম	১৮
ইসলামী ভ্রাতৃত্ব	৩৫
□ ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য	৩৭-৪৮
তাওহীদ প্রতিষ্ঠা	৩৭
বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা	৩৯
মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি অর্জন	৪০
নিঃস্বার্থ সম্প্রীতি স্থাপন	৪১
পারস্পরিক সহযোগিতা প্রদান	৪৪
পারস্পরিক কল্যাণ কামনা	৪৭
□ ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায়সমূহ	৪৯-৭২
সালাম প্রদান	৪৯
মুছাফাহা করা	৫০
হাদিয়া প্রদান	৫১
হাসিমুখে কথা বলা	৫২
পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা	৫৩
বিপদে-আপদে সাহায্য করা	৫৪
রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া	৫৬
আপোষ-মীমাংসা করা	৬০
দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা	৬২
যথোপযুক্ত সম্মান করা	৬৩
সুপারামর্শ ও সদুপদেশ দেওয়া	৬৪
দোষ-ত্রুটি শুধরে দেওয়া	৬৫

গীবত করা	৭৩
অশালীন কথাবার্তা বলা	৭৫
মিথ্যা কথা বলা	৭৯
অহেতুক কু-ধারণা করা	৮২
চোগলখুরী করা	৮৩
যুলুম বা অত্যাচার করা	৮৫
আমানতের খেয়ানত করা	৮৮
ওয়াদা খেলাপ করা	৯০
অপমান করা	৯১
ছিদ্রান্বেষণ করা	৯২
উপহাস করা	৯৩
তুচ্ছজ্ঞান বা হয়ে প্রতিপন্ন করা	৯৩
ক্ষতিসাধন করা	৯৪
ধোঁকা বা প্রতারণা করা	৯৪
হিংসা করা	৯৬
অহঙ্কার করা	৯৮
মন্দ নামে ডাকা	১০১
ক্রোধান্বিত হওয়া	১০২
সন্দেহযুক্ত আচরণ করা	১০৪
গালি দেওয়া	১০৪
পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ করা	১০৬

আব্দুর রহমান বিন আওফ	১০৮
খেজুর বাগান ভাগ করার প্রস্তাব	১০৮
জমি বন্টনের প্রস্তাব	১০৯
মৃত্যুর দ্বারা মানবতা	১১০

☐ উপসংহার ... ১১১-১১২

ভূমিকা

বর্তমান যুগ মুসলিম রেনেসার যুগ। বিশ্বের ইহুদী-খৃষ্টান পরাশক্তিগুলো ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে বহুমুখী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বর্তমানে তাদের ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম ইস্যু হল জঙ্গীবাদ ও সাম্প্রদায়িকতা। ইহুদী-নাছারাদের মদদপুষ্ট পাশ্চাত্যের প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশিত ও প্রচারিত খবরের সিংহভাগ জুড়ে আছে ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষ। যেমন- ইসলাম মানুষকে উগ্র হতে শিক্ষা দেয়, সন্ত্রাসী কায়দায় বোমা মেরে মানুষ হত্যা করে, ইসলাম মানুষকে সাম্প্রদায়িকতা শিক্ষা দেয় ইত্যাদি। আবার কোথাও কোন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড সংঘটিত হলে সন্ত্রাসীদের পরিচয় দিতে গিয়ে তারা উদ্দেশ্যমূলক ‘ইসলামী জঙ্গী’ বা ‘মুসলিম সন্ত্রাসী’ অথবা কোন মুসলিম রাষ্ট্রের ‘বংশোদ্ভূত’ ইত্যাদি যোগ করে প্রচার করে থাকে। এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীকে বুঝানো হয়, দেখ ইসলাম মানেই জঙ্গীধর্ম এবং মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী, সাম্প্রদায়িক। অথচ একথা দিবালাকের ন্যায় সত্য যে, ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম যেমন জঙ্গীবাদেও বিশ্বাস করে না, তেমনি মানুষকে সাম্প্রদায়িক হতেও শিক্ষা দেয় না। বরং ইসলাম এমন একটি ধর্ম, যা শুধু মুসলমানদের নয়, সমগ্র মানব জাতিকে শান্তির সরল পথ দেখায়। ইসলাম শুধু মুসলমানদের ধর্ম নয়, ইসলাম মানব জাতির ধর্ম। সমগ্র বিশ্বে ইসলামই একমাত্র ধর্ম, যে ধর্মে জাতি-গোত্র-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের সম্মান, মর্যাদা ও অধিকার পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত। প্রসঙ্গত, পাশ্চাত্য সমাজে ইসলাম বিরোধী বহুবিধ অপপ্রচারের ফলে এক শ্রেণীর সত্যানুসন্ধানী সচেতন মানুষের মধ্যে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে জানার আগ্রহ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে ইহুদী-খৃষ্টানদের ইসলাম ও মুসলিম বিদ্বেষী গোয়েবলসীয় প্রোপাগান্ডা কার্যত বুমেরাং (boomerang) হয়ে তাদেরকেই ঘায়েল করছে।

কিন্তু অতীব দুঃখের সাথে বলতে হয়, গোয়েবলসীয় পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য মিডিয়ার ব্যাপক ও বহুমুখী অপপ্রচারের ফলে খোদ মুসলমানরাই ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে নানা সংশয় ও সন্দেহের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। ক্ষেত্রবিশেষে অনেক মুসলমান (?) বিধর্মীদের সুরে সুর মিলিয়ে আপন ধর্মের বিরুদ্ধে অবস্থান নিতেও কুণ্ঠাবোধ করছে না। এর অন্যতম কারণ নিজ ধর্ম সম্পর্কে স্বচ্ছ, গভীর ও প্রকৃত জ্ঞানের অভাব। যে মুহূর্তে বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মের নামী-

দারী স্কলাররা ইসলাম ধর্ম গবেষণা করে আল্লাহর বিধান ও রাসূল (ﷺ)-এর চরিত্র-মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে স্থায়ী পৈত্রিক ধর্ম পরিত্যাগ করে স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্মের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করছে; ঠিক সেই মুহূর্তে আপন ধর্মের বিধি-বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ, পাশ্চাত্যের খুদ-কুড়ো খাওয়া কিছু হতভাগা পৈত্রিক মুসলমান নিজ ধর্মের বিধান পরিবর্তনের দাবীতে কলম ধরে, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে বক্তব্য দেয়, রাজপথে আন্দোলন করে। অথচ তারা ইসলাম ও মুসলিম বিরোধী এহেন অপতৎপরতায় যে পরিমাণ সময় ব্যয় করেন, তার একটি ক্ষুদ্রমত অংশও যদি নিজ ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের পেছনে ব্যয় করতেন, তাহলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস অন্তত কোন মুসলমানের সম্ভাবন এ রকম আত্মঘাতি জঘন্য ও ঘৃণ্য কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হতে পারতেন না।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান সুস্পষ্ট। আইয়ামে জাহেলি যুগের যে বর্বর সমাজে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে, গোত্রে গোত্রে হিংসা-হানাহানী, মারামারি, রক্তপাত, খুন-খারাবী, জেনা-ব্যভীচার ইত্যাদি ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। সেই জাহেলি সমাজের বর্বর মানুষগুলোকে একমাত্র ইসলামের সার্বজনীন বিধানের মাধ্যমেই বিশ্ব অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহানায়ক হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) ই অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে এমন সোনার মানুষ ও সমাজে পরিণত করেছিলেন, যারা মৃত্যুর কিনারে দাঁড়িয়েও কিভাবে অন্যের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করা যায়, তার অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন। আজকেও যদি ইসলামের বিধান দুনিয়ার মানুষ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও খোলামনে গ্রহণ করে নেয় এবং সে মুতাবেক জীবন, সমাজ, রাষ্ট্র ও বিশ্ব পরিচালনা করে, তবে বর্তমানে অশান্তির দাবানলে দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত এই পৃথিবীতে সেই স্বর্ণযুগ আবারো ফিরে আসবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

মুসলমানদের সে হত গৌরব পুনরুদ্ধারে মুখ্যত সচেতন মুসলমানদের-কেই এগিয়ে আসতে হবে। এক্ষেত্রে প্রধান কাজ হবে, সকল প্রকার ভেদাভেদ ও মতপার্থক্য ভুলে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিরপেক্ষ অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা। তার জন্য চাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মেষ। পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি ও বৃদ্ধির কৌশল ও গুরুত্বের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের সুমহান বাণী সর্বসাধারণের অবগতির মানসে আমাদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। এ গ্রন্থে অমুসলিম সম্প্রদায়, দুর্বল শ্রেণী, অবহেলিত বঞ্চিত মানবগোষ্ঠী, ভাগ্যহত অসহায় দাস-দাসী, আশ্রয়হারা ইয়াতীম ও পীড়িতজনের মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় রাসূল (ﷺ)-

এর শিক্ষা ও আদর্শ তথা কালোত্তীর্ণ মৌলিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় তাঁর শাস্ত্রতত্ত্ব অবদানের বর্ণনা স্থান পেয়েছে।

গ্রন্থের শুরুতে ভ্রাতৃত্বের শ্রেণীবিন্যাস পর্যায়ে বিশ্বভ্রাতৃত্ব তথা জাতি-ধর্ম-বর্ণ বিনির্দেশে আল্লাহর সৃষ্টি মানুষের প্রতি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের দলীলভিত্তিক আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায়ের পাশাপাশি ভ্রাতৃত্ব নষ্টের কারণও সবিস্তর আলোকপাত করা হয়েছে। পরিশেষে ইসলাম ও মানবীয় ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় যুগে যুগে মুসলমানদের দু'একটি অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হয়েছে। আশা করি এর মাধ্যমে যারা ইসলামকে সাম্প্রদায়িক ধর্ম হিসেবে মনে করেন, তাদের সে নিছক ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটবে। অপর দিকে আপন ধর্মের বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ মুসলমানরা নিজ ধর্মের অনুসারীর পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের সাথেও কিরূপ আচরণ বাঞ্ছনীয় সে বিষয়েও সুস্পষ্ট জ্ঞানার্জন করতে সক্ষম হবেন।

অত্র লেখাটি ধর্ম সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক আত-তাহরীক-এ জুলাই'১০ থেকে জানুয়ারী'১১ পর্যন্ত ৭টি সংখ্যায় 'ইসলামে ভ্রাতৃত্ব' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। বিজ্ঞ পাঠক ও সুভাষাজীদের অনুরোধ ও উৎসাহে লেখাটির শিরোনামে ঈষৎ পরিবর্তন এনে গ্রন্থাকারে প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। পত্রিকায় প্রকাশের সুবাদে গ্রন্থে সন্নিবেশিত দলীলাদিষ্টার সত্যাসত্য যাচাই-বাছাইয়ের একটা বড় সুবিধা পাওয়া গেছে। এজন্য আত-তাহরীক পরিবারের প্রতি রইল আন্তরিক শুভ কামনা। অত্র গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহযোগিতা পেয়েছি মাসিক আত-তাহরীকের গবেষণা সহকারী ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল. গবেষক জনাব নূরুল ইসলামের নিকট থেকে। উৎসাহ ও অনুপ্রেরণার পাশাপাশি লেখাটি সমৃদ্ধ করণের লক্ষ্যে নতুন নতুন তথ্য ও উপাত্ত সংযোজন এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ের অনুকূলে অতিরিক্ত দলীলাদি সংযোজনে তার সাহায্য আন্তরিক সহযোগিতা ও পরিশ্রম অনস্বীকার্য। মহান আল্লাহর নিকটে তার উত্তম প্রতিদান প্রত্যাশা করি। শত চেষ্টার পরও ভুলভ্রান্তির পূর্ণ দায় স্বীকার করে বিজ্ঞ পাঠকের নিকট থেকে সুপারামর্শের প্রত্যাশা রইল। মহান আল্লাহ আমাদের সকলের নেক প্রচেষ্টা কবুল করুন। আমীন!

॥ বিনীত ॥

লেখক

ইসলামী আন্দোলনে ভ্রাতৃত্ব

মহান আল্লাহর মনোনীত ও পছন্দনীয় একমাত্র ধর্ম হল 'ইসলাম'। পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে **إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ** 'নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে পছন্দনীয় ধর্ম হল ইসলাম'।^১ ইসলাম বিশ্বজনীন শান্তি ও সম্প্রীতির ধর্ম। বিশ্বজনীন শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন তাই সত্যিকারের 'ইসলামী আন্দোলন'। যুগে যুগে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত নবী ও রাসূলগণ। আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ এই ধর্ম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে হযরত আদম (عليه السلام) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা (ﷺ) পর্যন্ত একলক্ষ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূলের আগমন ঘটেছিল। শেষ নবীর আগমনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে নবী ও রাসূল আগমনের সিলসিলা বন্ধ হয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن** 'মুহাম্মাদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং সর্বশেষ নবী'।^২ তাই ক্বিয়ামত পর্যন্ত ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠার এ গুরু দায়িত্ব আমভাবে সকল মুসলমানের। যদিও বলা হয়েছে, 'আলেমগণ নবীদের উত্তরাধিকারী'।^৩ কিন্তু মহান আল্লাহ বলেন, **وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ** 'ঐ ব্যক্তির চেয়ে কার কথা উত্তম হতে পারে, যে লোকদেরকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করে?'^৪ আধুনিক বিশ্বে এ দায়িত্ব পালনে সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার কোন বিকল্প নেই। তাছাড়া সংঘবদ্ধ যিন্দেগী যাপনে ইসলামে জোরালো তাগিত রয়েছে। আল্লাহ বলেন, **وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا** 'তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর

১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯।

২. সূরা আল-আহযাব, আয়াত ৪০।

৩. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৮২; আব্দাউদ, হাদীছ নং ৩৬৪১; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ২২৩; মিশকাত, হাদীছ নং ২১২ 'ইলম' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ।

৪. সূরা হা-মীম-সেজদাহ, আয়াত ৩৩।

রজ্জুকে অত্যন্ত শক্তভাবে আঁকড়ে ধর। সাবধান! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’।^৭ আর যে কোন আদর্শ প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টার নামই আন্দোলন বা সংগঠন।

যেকোন আন্দোলন বা সংগঠনের ছয়টি মৌলিক উপাদান থাকে। যার কোন একটি বাদ দিলে সংগঠন পূর্ণাঙ্গ হয় না। উপাদান ছয়টি হল- ১. নির্দিষ্ট লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, ২. যোগ্য নেতৃত্ব, ৩. সঠিক কর্মসূচি, ৪. নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-বাহিনী, ৫. অর্থ ও ৬. নির্দিষ্ট ক্ষেত্র। উল্লিখিত ছয়টি মৌলিক উপাদানের মধ্যে নিবেদিতপ্রাণ কর্মী-বাহিনীর গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর রাসুলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দীর্ঘ ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনের অর্ধেকেরও বেশি সময় তিনি অতিবাহিত করেছিলেন মক্কায়। সেখানে যখন তিনি দ্বীনের দাওয়াত দিতে আরম্ভ করেন, তখন মক্কার প্রতিষ্ঠিত কুফুরী শক্তি তাঁকে নানাভাবে অত্যাচার, উৎপীড়ন ও নির্যাতন করলেও কর্মী-বাহিনীর অভাবে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কোন প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হননি। অতঃপর আল্লাহর নির্দেশে মদীনায় হিজরত করে যখন তিনি একটি সুসংগঠিত কর্মী-বাহিনী তৈরি করতে সক্ষম হয়েছিলেন; তখন তিনি উক্ত কর্মী-বাহিনীর মাধ্যমে শত্রুর মোকাবেলা ছাড়াও তাদেরকে দিয়ে কাজিত সমাজসংস্কারে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের প্রধানত দু’টি বিষয়ে সর্বদা সচেত্ন থাকতে হয়। একটি হল নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ ও একনিষ্ঠ আনুগত্য; অপরটি হল কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক বজায় রাখা। যেটাকে ইসলামী শরী‘আতে ব্যাপক অর্থে ‘ভ্রাতৃত্ব’ বলা হয়ে থাকে। এ গ্রন্থে কর্মীদের এই দ্বিতীয় বিষয়টি নিয়ে সবিস্তার আলোচনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। কেননা নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি যদি কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধন সৃষ্টি না হয়, তাহলে বিভ্রান্তি ও বিভক্তির কবলে পড়ে সময়ের ব্যবধানে সে আন্দোলন যে ব্যর্থ হবে, এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। ব্যাপক অর্থে যেহেতু প্রত্যেক মুসলমানই ইসলামী আন্দোলনের একেকজন কর্মী; সেহেতু ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ মানেই মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ। মূলত ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার এই সার্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য রেখে অত্র গ্রন্থে আলোচনার ভাষাও মোটামুটি সেভাবে ব্যবহৃত হয়েছে।

সঙ্গী হিসেবে হাওয়া (হাওয়া) -কে সৃষ্টি করে এর উৎকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছেন। সহজাত প্রবৃত্তির তাড়নার পাশাপাশি মানব জীবনে পৃথিবীর বহুমুখী প্রয়োজন পূরণের ক্ষেত্রেও সমাজবদ্ধ পরিবেশের কোন বিকল্প নেই। একজন কৃষক যেমন স্কুলে মাস্টারী করতে পারে না; তদ্রূপ একজন মাস্টারের পক্ষেও কৃষি কাজ করা সম্ভবপর হয়ে ওঠে না। অথচ কৃষি কাজেও শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আবার শিক্ষকেরও কৃষির উৎপাদিত পণ্যের প্রয়োজন আছে। অনুরূপভাবে কামার, কুমির, জেলে, নাপিত, ব্যবসায়ী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি সর্ব পেশার মানুষ পরস্পরের উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভরশীল। আর এ সবার সমন্বয়েই একটি সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে উঠে। তাই সমাজ-বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করা কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন ভাবেই সম্ভব নয়। মানব জীবনে সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলতে গিয়ে সমাজ বিজ্ঞানী ম্যাকাইভার বলেন,

Man is dependent on society for protection, comfort, nurture, education, equipment, opportunity and the multitude of definite services which society provides. His birth in society brings with it the absolute need of society itself. মানুষ তার নিরাপত্তা, সুখ, পরিচর্যা, শিক্ষা, উপকরণ, সুযোগ-সুবিধা এবং সমাজের দেয়া বহুমুখী সেবাকার্যের জন্য সমাজের উপর নির্ভরশীল। সমাজে মানুষের জন্মগ্রহণই সমাজের প্রয়োজনীয়তার কথা সূচিত করে।

মানুষ হিসেবে সমাজে সকল মানুষের মর্যাদা সমান। কে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করল, কার গায়ের চামড়া কেমন, কার দৈহিক কাঠামো কেমন, তার উপর ভিত্তি করে কারো সম্মান বা মর্যাদা নির্ধারিত হয় না। এক্ষেত্রে হযরত আলী (রাঃ) রচিত নিম্নের কবিতাটি প্রশিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّمَثِيلِ أَكْفَاءُ * أَبُوهُمْ آدَمُ وَالْأُمُّ حَوَاءُ
نَفْسٌ كَنَفْسٍ وَأَرْوَاحٌ مُشَاكِلَةٌ * وَأَعْظَمُ خَلَقَتْ فِيهَا وَأَعْضَاءُ
فَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ فِي أَصْلِهِمْ حَسَبٌ * يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطَّيْنُ وَالْمَاءُ

‘আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের পিতা আদম ও মাতা হাওয়া। একটি প্রাণ আরেকটি প্রাণের ন্যায় এবং তাদের রূহগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রত্যেকের দেহ হাড়ি দ্বারা তৈরি, আর তাতে রয়েছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যদি মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে গর্ব করার মত কিছু থাকে, তবে তা হল মাটি ও পানি’।^৮ তবে কর্মে, জ্ঞানে, পদমর্যাদায় একজন

يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ، لَأَفْضَلُ لِعَرَبِيٍّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لَأَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ وَلَا لَأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ إِلَّا بِالتَّقْوَى، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

‘হে জনগণ! হুশিয়ার হও। তোমাদের প্রভু মাত্র একজন। সাবধান হও! আরবীয়ের জন্য আজমীর উপরে কোন প্রাধান্য নেই, আজমীর জন্য আরবীয়ের উপরে কোন প্রাধান্য নেই। কালোর উপরে লালের বা লালের উপরে কালোর কোন প্রাধান্য নেই, তাকুওয়া ব্যতীত। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকটে সেই সর্বাধিক সম্মানিত ব্যক্তি, যে সর্বাধিক আল্লাহুভীর’।^{১০} ইসলামী শরী‘আতের বিধান মতে আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-গরীবের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। এক কথায় সকলেই আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।

তাই একজন মানুষের পক্ষে অন্য মানুষকে ঘৃণা করা, অবজ্ঞা করা, অপমান বা অসম্মান করা, হেয়জ্ঞান করার কোন সুযোগ ইসলামে নেই। বরং যে মানুষ আত্মমর্যাদার সঙ্গে পরমর্যাদার বিষয়টি সংযুক্ত করে আত্ম-পর এক করে গ্রহণ করে, সেই প্রকৃত মানুষ। আর একে অপরের প্রতি এই সহানুভূতিশীল মনোভাবকেই বলে 'ভ্রাতৃত্ব'।

৯. আর-রাহীকুল মাখতুম (আরবী), পৃ. ৪০৫।

১০. আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৫৩৬।

ভ্রাতৃত্বের প্রকারভেদ

আরবিতে أُخُوَّةُ শব্দের অর্থ ভ্রাতৃত্ব, বন্ধুত্ব ইত্যাদি। তত্ত্বকথায় পরস্পরের মধ্যে হৃদয়তা, আন্তরিকতা, সম্প্রীতি, বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ্যপূর্ণ নিবিড় সম্পর্ককে ভ্রাতৃত্ব বলা হয়। ইসলাম শান্তির ধর্ম, আর শান্তির অন্যতম নিয়ামক হল ভ্রাতৃত্ব। বাস্তবতার নিরিখে অর্থাৎ ব্যবহারিক দিক থেকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ‘ভ্রাতৃত্ব’ তিন প্রকার। যেমন- ১. জন্মগত ভ্রাতৃত্ব, ২. জাতিগত বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব এবং ৩. ইসলামী ভ্রাতৃত্ব। ভ্রাতৃত্বের এই তিনটি স্তর কমবেশি পরস্পরের পরিপূরক। ইসলামী শরী‘আতে ভ্রাতৃত্বের উক্ত তিনটি স্তরই স্বীকৃত।

□ জন্মগত ভ্রাতৃত্ব :

একই পিতার ঔরসজাত সহোদর সন্তানের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ব তাই জন্মগত ভ্রাতৃত্ব। আর এটিই সকল ভ্রাতৃত্বের উৎসমূল।

□ জাতিগত বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব :

মানুষ সৃষ্টিগতভাবে যেমন পরস্পর ভাই ভাই, তেমনি ব্যবহারিক দিক থেকে লক্ষ্য করলেও দেখা যায়, মানুষ যে দেশের, ভাষার, গোত্রের, বর্ণের বা পরিবেশের হোক না কেন, সকলের মৌলিক চাহিদা, অনুভূতি ও উপলব্ধির মধ্যে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। শ্বসন প্রক্রিয়া, রেচনতন্ত্রের ক্রিয়া, শোণিত প্রবাহসহ শরীরের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গাদির ক্রিয়া-কর্ম সকল মানুষের একই। তাই বিশ্বের সকল মানুষ ভাই ভাই। এটাই হল মানুষের জাতিগত ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উৎস হল তাওহীদ। একজন মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহর দাসত্ব করবে, অন্য কারো নয়। তার উন্নত ললাট দুনিয়ার কোন মানুষের সামনে কিংবা দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী কোন বীরের কাছেও নত হবে না। সকলে আদম সন্তান হিসেবে ভাই ভাই। সুতরাং সবাই সবার সুখ-দুঃখের সাথী হয়ে মিলে-মিশে শান্তিতে বসবসা করবে- এটাই মূলত তাওহীদী ভ্রাতৃত্বের অন্তর্নিহিত দাবী।

কালের বিবর্তনে বনু আদমের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনের তাগিদে তারা বিস্তীর্ণ ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে দূরত্ব, আবহাওয়া, ভৌগলিক পরিবেশসহ বিভিন্নমুখী প্রভাবে তারা নানা গোত্র, বর্ণ, আকার-আকৃতি, স্বভাব-প্রকৃতি ও ভাষার মানদণ্ডে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। স্বতন্ত্র পরিচয়ে পরিচিত হয়ে ওঠার পাশাপাশি পর্যায়ক্রমে তাদের আদি ভ্রাতৃত্বের বন্ধনেও ফাটল ধরে। ফলশ্রুতিতে যত দিন যায় ততই তারা সৃষ্টির আদি ও প্রকৃত পরিচয় ভুলে কার্যক্ষেত্রে একে অপরের শত্রুতে পরিণত হতে থাকে। ধন-সম্পদ, বংশ-মর্যাদা এবং ভাষা ও বর্ণের মিথ্যা আভিজাত্যের দন্ডে মদমত্ত হয়ে তারা দিন দিন অন্ধ হয়ে পড়ে। যে কারণে অতি তুচ্ছ বিষয় ও ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে ভাইয়ে ভাইয়ে মারামারি, কাটাকাটি, হিংসা-হানাহানী, খুন, রাহাজানী ইত্যাকার উচ্ছৃঙ্খল ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে মানুষ অহরহ লিপ্ত হয়ে পড়ছে। এই বংশ, গোত্র, অর্থ-সম্পদ, বর্ণ-রূপ, ভাষা-অঞ্চল, আকৃতি-প্রকৃতি প্রভৃতি ভেদবুদ্ধির কাল্পনিক প্রাচীর খাড়া করে ধর্মের দোহায় পেড়ে আবহমান কাল থেকেই পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ প্রভুত্বের আসনে সমাসীন হয়ে অসহায় নিঃস্ব শ্রেণীর মানুষগুলোকে দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করে রাখতে অভ্যস্ত। নিম্নে এ ধরনের ছিটেফোটা কিছু নজির উপস্থাপন করা হল।

হিন্দু সমাজে পারস্পরিক সম্পর্ক :

ভারতীয়রা শুরু থেকে আজ পর্যন্ত তাদের ছাড়া সারা দুনিয়ার মানুষকে 'ম্লেচ্ছ', 'অস্পৃশ্য', 'যবন' ইত্যাদি গণ্য করেছে। একই সাথে জন্মগতভাবে নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র- এই চারটি বর্ণে বিভক্ত করে নিজেদের মধ্যে মান, মর্যাদা ও অধিকারের তারতম্য সৃষ্টি করে রেখেছে। হিন্দুধর্ম মতে ব্রাহ্মণ হল তাদের ধর্মের শ্রেষ্ঠ শ্রেণী। এরা ধর্মীয় প্রতিনিধি। বেদের শিক্ষা গ্রহণ, উপটোকন ও নজর-নেয়াজ গ্রহণের একমাত্র অধিকারী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। তাদের বিশ্বাস এই পৃথিবীর সকল কল্যাণ ও সৌন্দর্য ব্রাহ্মণদের দান। এ ধর্মে ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্যদের ধর্ম-কর্ম করার অধিকার পর্যন্ত খর্ব করা হয়েছে। তাই যে অপরাধে অন্যদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড; সেই একই অপরাধে ব্রাহ্মণ সন্তানের সর্বোচ্চ শাস্তি হবে মাথা ন্যাড়া করা। দশ বছরের ব্রাহ্মণপুত্র ক্ষত্রিয় শতবর্ষের বৃদ্ধের জন্যেও পিতার মর্যাদা রাখে। ব্রাহ্মণরা যে কোন শ্রেণীর নারীর পানি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অন্য শ্রেণীত্রয়ের কেউ ব্রাহ্মণ নারীকে বিয়ে করতে পারবে না। তাছাড়া যদি কোন

ব্রাহ্মণ শূদ্র শ্রেণীর কোন নারীকে বিয়ে করে বসে, তাহলে সেও নরকের উপযুক্ত বলে বিবেচিত।

ক্ষত্রিয়দের কাজ হল, নজরানা দেয়া, রাখালী করা, আর রক্ষণা-বেক্ষণের কাজ করা। বৈশ্যদের কাজ হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও কৃষিকাজ করা, গরু-ছাগল লালন-পালন করা ইত্যাদি। ভাব খানা এরকম যেন এদের সৃষ্টিই হয়েছে ব্রাহ্মণদের সেবা-যত্নের জন্য।

সবচেয়ে দুর্ভাগা শ্রেণী হল শূদ্ররা। এরা হল ভৃত্যশ্রেণী। শূদ্ররা ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে না। ব্রাহ্মণদের সাথে উঠা-বসাও করতে পারবে না। এদের কাজ হল পূর্ণ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে ব্রাহ্মণদের সেবা করা। ব্রাহ্মণরা চাইলে শূদ্রদের অর্থ-সম্পদ ইচ্ছামত নিয়ে নিতে পারে। শূদ্ররা যদি এদের চেয়ে উপরের কোন শ্রেণীর প্রতি হাত তোলে, তাহলে তার হাত কেটে দেয়া হবে। রাগের বশে যদি কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে লাথি মারে, তবে তার পা কেটে দেয়া হবে। যদি কোন কারণে কোন শূদ্র কোন ব্রাহ্মণকে গালি দেয়, তবে তার জিহ্বা তালু থেকে আলাদা করে ফেলা হবে। যদি কোন শূদ্র দাবী করে, সে কোন ব্রাহ্মণ সন্তানকে শিক্ষা দিতে সক্ষম, তাহলে তাকে ফুটন্ত তৈল পান করান হবে ইত্যাদি। তাছাড়া বংশ-মর্যাদা ও কৌলীন্য রক্ষার নামে ধর্মের দুহায় পেড়ে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও সতীদাহ প্রথার মত কর্দম ও ঘৃণিত কর্মকাণ্ড তো আছেই। এক কথায় হিন্দু ধর্মে মানুষের মর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোন সুযোগ নেই।

ইহুদী-খৃষ্টানসহ অন্যান্য ধর্ম ও জাতির মধ্যে সম্পর্ক :

প্রাচীন ইরানীয়রাও চারটি জাতিতে বিভক্ত ছিল। ইরানীয়দের ধারণা ছিল, বাদশাহ বা তার খান্দানের ধর্মনীতে স্বয়ং আল্লাহর রক্ত প্রবাহিত। রোমানরা নিজেদেরকে প্রভুত্বের আসনে সমাসীন করে অন্যদেরকে গোলাম তুল্য জ্ঞান করত। প্রাচীন ইহুদীরা নিজেদের ব্যতীত দুনিয়ার সবাইকে পাপী ও ছোটলোক মনে করত। বনী ইসরাঈলরা পৃথিবীর অপরাপর জাতিসমূহের উপরে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের ক্ষেত্রে চরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের মানসে নিজেদেরকে আল্লাহর সন্তান বলে গণ্য করত। অথচ একথা সকলেরই জানা যে, আল্লাহর কোন সন্তান নেই, থাকার কথাও নয়।^{১১} এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ.

‘ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে, আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন। আপনি বলুন, তবে তিনি তোমাদেরকে পাপের বিনিময়ে কেন শাস্তি প্রদান করবেন? বরং তোমরাও অন্যান্য সৃষ্ট মানবের অন্তর্ভুক্ত সাধারণ মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দান করেন’।^{১২}

চীনের প্রাচীন নামই ‘স্বর্গরাজ্য’। সুতরাং তাদের নিকট চীন বাদে সমগ্র পৃথিবী নরক তুল্য। ইউরোপে শ্বেতাঙ্গরা সভ্যতা ও সংস্কৃতির একচ্ছত্র অধিকারী বলে দাবী করত। কৃষ্ণাঙ্গরা তাদের সমপর্যায়ের বলে বিবেচিত হত না। কথিত বিশ্ব মানবদরদী আমেরিকানদের দৃষ্টিতে সেখানকার হাবশী বা নিগ্রো বাসিন্দাদের তো বেঁচে থাকারও কোন অধিকার ছিল না। সেখানে সাদা-কালোর বৈষম্য এত প্রকট ছিল যে, তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে কৃষ্ণাঙ্গরা শ্বেতাঙ্গদের সাথে একই প্রতিষ্ঠানে পড়া-লেখা করার অধিকার পর্যন্ত পেত না। চিত্তবিনোদন, খেলাধুলা, হোটেল, পার্ক, ক্লাব ইত্যাদি ক্ষেত্রেও শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ বৈষম্য প্রকট ছিল। একবিংশ শতাব্দির অত্যাধুনিক যুগেও সে দেশে অনেকাংশে এই ঘৃণ্য বর্ণ-বিভাজন বিদ্যমান আছে। দক্ষিণ ও পূর্ব আফ্রিকায় কেবল হাবশীই নয়; বরং ভারতীয় তথা এশীয়রাও মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। পার্থিব অধিকারের বিষয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সামাজিক পরিমণ্ডলের সীমা ছাড়িয়ে এ সব ভেদাভেদ ইবাদতগৃহ পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সৃষ্টিকর্তার দুই বান্দা একই উপাসনালয়ে প্রার্থনা করার কোন সুযোগ নেই। শ্বেতাঙ্গদের গির্জা আলাদা, কৃষ্ণাঙ্গদের গির্জা আলাদা।

অথচ তারা একটি বারের জন্যও চিন্তা করে না যে, বাইরের ঐ পাতলা চামড়াটুকুর নিচে যে আসল প্রাণশক্তি রুধির ধারা; রাসায়নিক বিশ্লেষণে তাতে কোনই পার্থক্য নেই। তাছাড়া মানুষে মানুষে গোত্র, ভাষা ও বর্ণের বিভাজনে তাদের নিজেদের কোন হাত নেই। এটি সমগ্র বিশ্বের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহর পক্ষ থেকেই হয়েছে। যার মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক পরিচিতি; গর্ব-অহঙ্কার বা ঘৃণা করার জন্য নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

বিশ্বভ্রাতৃত্বে ইসলাম :

মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, গোত্রে গোত্রে, বর্ণে বর্ণে এই যে বিভেদের প্রাচীর সহস্রাধিক বর্ষ হতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে মানুষের জ্ঞান, পৌরুষ ও আত্মসম্মানকে নিরবে নিভৃতে ধিক্কার দিচ্ছিল; মানব জাতির মুক্তির মহান পথপ্রদর্শক মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) এসে সে বাধার প্রাচীর চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়ে মহাসাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী উচ্চারণ করে মানুষের মৌলিক অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি উদাস্ত কণ্ঠে ঘোষণা করলেন, ‘হে মানবমণ্ডলী! সাবধান, নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের প্রভু এক। অতএব অনারবীর উপর আরবের, আরবীর উপর অনারবের, লালের উপরে কালোর এবং কালোর উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত’।^{১৪} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন, النَّاسُ بَنُو آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ আরো বলেন, ‘প্রত্যেক মানুষ আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি’।^{১৫} তাই মানুষে মানুষে গর্ব-অহঙ্কারের কিছু নেই।

মানবতার চিরন্তন আকাজ্ঞা হচ্ছে বিশ্বজুড়া প্রেম, ভালবাসা, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা। বিশ্বের শান্তি-শৃঙ্খলা ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে জাতি, ধর্ম, ভাষা, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষের উচিত বিশ্বভ্রাতৃত্বের অধীনে সংঘবদ্ধ হয়ে মহা কল্যাণের অনুগামী হওয়া। আর এটাই ইসলাম প্রবর্তিত সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্ব। ইসলাম কোন অঞ্চল বা জাতি বিশেষের ধর্ম নয়। ইসলাম মানব জাতির ধর্ম। তাই ইসলাম কোন অবস্থাতেই যে কোন অযুহাতে মানুষে মানুষে বিভেদকে সমর্থন করে না।

১৩. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১৩।

১৪. আহমাদ, হাদীছ নং ২৩৫৩৬।

১৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ৩৯৫৬; আহমাদ, হাদীছ নং ৮৯৭০, হাদীছ হাসান।

মানবতার মহান নেতা হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)। মহানবী (ﷺ) যেমন কোন গোত্র বা বংশ বিশেষের নবী ছিলেন না, তেমনি তাঁর আনীত বিধানও (অহি) কোন বিশেষ বর্ণ, বংশ, গোত্র বা অঞ্চল বিশেষের বিধান ছিল না। তা ছিল সমগ্র মানব জাতির চলার বিধান। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **شَهْرُ** 'রামাযান মাস সেই মাস, যে মাসে কোরআন অবতীর্ণ হয়েছে, যা সকল মানুষের জন্য পথপ্রদর্শক'।^{১৮} শুধু অহির বিধানই সকল মানুষের জন্য আসেনি; ঐ অহির যিনি ধারক ও বাহক ছিলেন তিনিও সমগ্র মানব জাতির নবী। মহান আল্লাহ বলেন, **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا**। 'আমি সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে আপনাকে প্রেরণ করেছি'।^{১৯} মহান আল্লাহ তাঁকে শুধু সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে নয়, তিনি তাঁকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, অঞ্চল, মুসলিম, অমুসলিম, কীট-পতঙ্গ, পশু-পাখি, গাছ-পালা, প্রকৃতি-পরিবেশ নির্বিশেষে সারা জাহানের রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেন, **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ**। 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের রহমত স্বরূপ প্রেরণ করেছি'।^{২০}

আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সারাজাহানের কল্যাণকামী নবী বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করে বলেন, **إِنَّ دِمَائَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ** 'তোমাদের একের রক্ত (জীবন) ও সম্পদ তোমাদের অপরের প্রতি (সকল দিনে, সকল মাসে, সকল স্থানে) হারাম; যেভাবে এই দিনে, এই মাসে, এই শহরে হারাম'।^{২১}

এই মর্মে রাসূল (ﷺ) আরও বেশ কিছু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন-
عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَنْ لَا يَرْحَمُ النَّاسَ।

১৮. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ১৮৫।

১৯. সূরা সাবা, আয়াত ২৮।

২০. সূরা আখিয়া, আয়াত ১০৭।

২১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ২৫৫৫।

জারীর ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিরাজা) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা সেই ব্যক্তির উপর অনুগ্রহ করেন না, যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি অনুগ্রহ করে না’।^{২২}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ قِيلَ مَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الَّذِي لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.

আবু হুরায়রা (রাযিরাজা) হতে বর্ণিত নবী করীম (ﷺ) বলেন, ‘আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। আল্লাহর কসম! সে ঈমানদার নয়। জিজ্ঞেস করা হল, হে রাসূলুল্লাহ (ﷺ)! সে কে? তিনি বললেন, যার প্রতিবেশী তার অনিষ্ট হতে নিরাপদ নয়’।^{২৩} অন্য হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارَهُ بَوَائِقَهُ.

হযরত আনাস (রাযিরাজা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়’।^{২৪}

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ، وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিরাজা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম সাথী সে, যে তার সঙ্গী-সাথীর নিকট উত্তম। আর আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম প্রতিবেশী সে, যে তার পड़শির নিকট উত্তম’।^{২৫} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আরো বলেন,

مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحِبَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْ يُحِبَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيَصْدُقْ حَدِيثَهُ إِذَا حَدَّثَ، وَلْيُؤَدِّ أَمَانَتَهُ إِذَا أُؤْتِمِنَ. وَلْيُحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ.

২২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৪৭;

আল-আদাবুল মুফরাদ, তাহকীক : আলবানী, হাদীছ নং ৯৬।

২৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৬২।

২৪. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৬৩।

২৫. তিরমিযী, দারেমী, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৮৭; ছহীহ তারগীব, হাদীছ নং ২৫৬৮, সনদ ছহীহ।

‘যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ)-কে ভালবাসতে চায় অথবা চায় যে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ﷺ) তাকে ভালবাসুক, সে যেন কথা বলার সময় সত্য কথা বলে, আমানত রাখা হলে তা আদায় করে এবং প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর আচরণ করে’।^{২৬}

عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو دُبَحَتْ لَهُ شَاةٌ فِي أَهْلِهِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ :
أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ أَهْدَيْتُمْ لِحَارِنَا الْيَهُودِيَّ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِينِي بِالْحَجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيَرُونَهُ.

মুজাহিদ থেকে বর্ণিত, আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাহিমাহু-এ) এর জন্য তার পরিবারে ছাগল যবেহ করা হল। তিনি এসে বললেন, তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু পাঠিয়েছ? তোমরা কি আমাদের ইহুদী প্রতিবেশীকে হাদিয়া স্বরূপ কিছু পাঠিয়েছ? আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, আমাকে জিবরীল (জালাইলিক) প্রতিবেশীর ব্যাপারে সর্বদা উপদেশ দিয়ে থাকেন। এমনকি আমার এ ধারণা সৃষ্টি হল যে, তিনি তাকে ওয়ারিহ বানিয়ে ছাড়বেন।^{২৭}

إِرْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مَّنْ
অন্য এক হাদীছে তিনি বলেন, ‘তোমরা পৃথিবীবাসীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে আসমানে যিনি
আছেন তিনি ও তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন’।^{২৮} অপর হাদীছে আছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ جَعَلَ اللَّهُ
عَزَّ وَجَلَّ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عَنْدَهُ تِسْعَةٌ وَتِسْعِينَ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ
جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَأَّحُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ
وَلَدِهَا، خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ.

আবু হুরায়রা (রাহিমাহু-এ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ﷺ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, ‘আল্লাহ তা‘আলা দয়াকে একশ’টি অংশে

২৬. বায়হাকী, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৯০, হাদীছ হাসান।

২৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৪৩, ‘প্রতিবেশীর হক্’ অনুচ্ছেদ; আব্দাউদ, হাদীছ ৫১৫২;

আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১২৮, ‘ইহুদী প্রতিবেশী’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।

২৮. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৯৪১; তিরমিযী, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৬৯, হাদীছ ছহীহ।

বিভক্ত করেছেন। অতঃপর তাঁর নিকটে ৯৯টি অংশ রেখে দিয়েছেন এবং পৃথিবীতে মাত্র একটি অংশ দিয়েছেন। সেই অংশ থেকেই সৃষ্টজীব পরস্পর দয়া করে। এমনকি পদদলিত হওয়ার ভয়ে ঘোড়া সন্তান থেকে তার ক্ষুরকে উঁচু করে রাখে।^{২৯}

এখানেই শেষ নয়, পৃথিবীতে আল্লাহর বিধান প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের লক্ষ্যে তাঁর পক্ষ থেকে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার পয়গম্বর প্রেরিত হয়েছেন।^{৩০} কিন্তু তাঁদের সকলের পরিচয় জানা যায় না। তাই ইসলাম ধর্মে অন্য ধর্মের প্রবর্তকদের নাম শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করার বিধান দেওয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, সকল নবী-রাসুলের উপর বিশ্বাস করা ঈমানের পরিচায়ক। হাদীছে জিবরীলে ঈমানের পরিচয় দিতে গিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন,

أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

‘আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমানী কিতাবসমূহ, রাসূলগণ, পরকাল এবং ভাগ্যের ভাল-মন্দের উপর বিশ্বাস করা’।^{৩১} আর এটি বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্যতম বড় নিদর্শন। শুধু পয়গম্বর নয়, অন্যান্য ধর্মে যেসব দেব-দেবী আছে যাদেরকে ইসলাম সমর্থন করে না; তাঁদের সম্বন্ধেও কোন কটাক্ষ বা কটুবাক্য বলা ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। কারণ কোন মুসলমান কোন অমুসলমানের উপাস্যকে গালি দিলে সেও প্রতিশোধ প্রায়ণ হয়ে মুসলমানের উপাস্য তথা আল্লাহকে গালি দিবে। আল্লাহ বলেন, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. ‘আর আল্লাহকে ছেড়ে যাদের তারা আরাধনা করে, তোমরা তাদেরকে মন্দ বল না। তাহলে তারা ধৃষ্টতা করে অজ্ঞতাবশত আল্লাহকে মন্দ বলবে’।^{৩২} তখন কোন অমুসলমান কর্তৃক আল্লাহকে গালি দেওয়ার বিষয়ে ঐ মুসলমানই দায়ী। তাছাড়া একজন মুসলামান দৈনন্দিন ছালাতের শেষ পর্যায়ে ডানে-বামে সালাম ফিরানোর মাধ্যমে তার চারপাশে অবস্থিত সকল প্রকার জীবের জন্য আল্লাহর নিকটে শান্তি ও কল্যাণের প্রার্থনা করে থাকে। আপন প্রার্থনায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য আল্লাহর দরবারে কল্যাণ কামনার

২৯. বুখারী, হাদীছ নং ৬০০০; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১০০।

৩০. আহমাদ, তাবারাণী, মিশকাত, হাদীছ ৫৭৩৭; সিলসিলা হুহীহা, হাদীছ নং ২৬৬৮।

৩১. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ২।

৩২. সূরা আল-আন’আম, আয়াত ১০৮।

মাধ্যমে বিশ্বভ্রাতৃত্বের এই চূড়ান্ত নিদর্শন ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্মে খুঁজে পাওয়া যাবে না। তাই ইসলাম শুধু মুসলমানদের ধর্ম নয়, মানবজাতির ধর্ম এবং মুহাম্মাদ (ﷺ) শুধু মুসলমানদের নবী নন, সমগ্র মানবজাতির নবী তথা বিশ্বনবী।

ইসলাম মনে করে মানুষের বংশ-গোত্র, ধন-দৌলত কোন কিছুই মানুষ-মানুষে বৈষম্য সৃষ্টি করতে পারে না। ইসলামের দৃষ্টিতে প্রত্যেক মানুষ মানবতার বিরাট বাগিচার এক একটি ফল। আর এটাই সত্যিকারের বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলাম এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। মানুষের চিরাচরিত বন্ধমূল বিশ্বাস হল, মর্যাদা জন্ম বা বংশগত ব্যাপার। মানুষ এটা জন্মগতভাবেই লাভ করে থাকে। বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে এ ধারণার বাস্তব প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। পক্ষান্তরে বিশ্বমানবতার নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) শিখালেন, মর্যাদা কোন রক্ত, বংশ বা জন্মগত বিষয় নয়; এটা অর্জনের বিষয়। মানুষের মর্যাদা মাপের মূল ভিত্তি হল তার কর্ম ও অবদান। কর্মের নিরিখেই মানুষ বড় বা ছোট হয়। মহান আল্লাহর নিকটে মানুষ স্বীকৃত বা দ্বিকৃত হয় তার কর্মের বিচারে; জন্ম, বংশ বা অঞ্চলের বিচারে নয়। তাইতো ঐতিহাসিক বিদায় হজ্জের ভাষণে লক্ষ জনতার সমাবেশে স্পষ্ট ভাষায় মহানবী (ﷺ) ঘোষণা করেন, ‘অনারবীর উপর আরবের, আরবীর উপর অনারবের, লালের উপরে কালোর এবং কালোর উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাক্বওয়া ব্যতীত। তোমাদের মধ্যে সেই সর্বাধিক মর্যাদাবান, যে ব্যক্তি বেশি আল্লাহ্‌ভীরু’।^{৩৩} এর মাধ্যমে তিনি মানব সমাজের অবাঞ্ছিত ভেদ-বিভাজন ও শ্রেণী-কলঙ্কের মূলোৎপাটন করে ভাষা, অঞ্চল ও বংশ ভিত্তিক সকল অহমিকার সৌধ চুরমার করে দিলেন। যা আবহমান কাল থেকে মানুষকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত করে রেখেছিল।

একবার আবু লাহাব রাসূল (ﷺ)-এর দরবারে উপস্থিত হয়ে বলল, আমি যদি তোমার ধর্ম কবুল করি তাহলে কি পাব? রাসূল (ﷺ) বললেন, অন্যান্য মুসলমানগণ যা পান আপনিও তাই পাবেন। আবু লাহাব বলল, আমি কি স্বতন্ত্র কোনই মর্যাদা পাব না? সে ভেবেছিল, আমি নবীর চাচা, সুতরাং আমার জন্য তো কিছু বাড়তি মর্যাদা থাকবেই। যখন সে জানতে পারল সে রকম কোন সম্ভবনা নেই, তখন সে নিরাশ হয়ে বলে উঠল, ۞

‘لَهَذَا الدِّينِ - ثَبًّا أَنْ أَكُونَ وَ هَوْلَاءِ سَوَاءٌ’।^{৩৪} এমনভাবে ইসলাম মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকলের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

শুধু মানুষের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় নয়, ধর্মের ক্ষেত্রেও তিনি চরমভাবে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামে এমন কোন বিধান নেই যে, কেবল অমুক বংশ বা গোত্রের লোকেরাই ধর্ম গ্রহণ বা চর্চা করতে পারবে। ধর্মীয় শিক্ষা, পদ ও মর্যাদার ক্ষেত্রে কোন জাত-পাতের ভাগাভাগি না করে বরং যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন মানুষ এর অধিকারী হতে পারবেন। এ কারণেই স্বয়ং সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা বড় বড় আলিম ও জ্ঞানপণ্ডিত হিসেবে বরণ্য ও গ্রহণযোগ্য ছিলেন, তাঁদের অনেকেই কুরাইশ বংশীয় ছিলেন না। তাছাড়া ধর্ম গ্রহণের ক্ষেত্রেও ইসলামের বিধান অত্যন্ত উদার। মহান আল্লাহ নিজেই বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ‘দ্বীনের ব্যাপারে কোন জবরদস্তি নেই’।^{৩৫} অর্থাৎ কেউ যদি স্বেচ্ছায় দ্বীন গ্রহণে আগ্রহী না হয়, তাহলে দ্বীন গ্রহণে তাকে বাধ্য করা যাবে না। কেননা নবী বা তাঁর অনুসারীদের দায়িত্ব হল দ্বীনের দাওয়াত দেওয়া, দ্বীন গ্রহণ করানো নয়। হেদায়েতের মালিক আল্লাহ। উল্লেখ্য, বর্তমানে এ আয়াতের নানা রকম ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এ আয়াতের আলোকে অনেকে বলতে চায়, কোন মুসলমান যদি স্বেচ্ছায় ইসলামের কোন বিধান না মানে, তাহলে তাকে জোর করে কিছু বলা যাবে না। অথচ এটি দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট যে, আয়াতটি বিধর্মীদের ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে, মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান পালনের ক্ষেত্রে নয়।

বিচারিক ক্ষেত্রেও ইসলাম পরম সাম্য ও উদারতার পরিচয় দিয়েছে। ইসলাম ধর্মে আইনের চোখে সকলে সমান। একই কর্ম ইসরাঈলীয়দের জন্য বৈধ, আর অ-ইসরাঈলীয়দের জন্য অবৈধ; অথবা একই অপরাধের জন্য সাধারণের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড আর ব্রাহ্মণের জন্য মাথা ন্যাড়া করা, অথবা মুসলমানের জন্য এক শাস্তি আর অমুসলমানের জন্য অন্য শাস্তি এমন পক্ষপাতদুষ্ট আইন ইসলাম বরদাস্ত করে না। নিম্নে ইসলামী আনুশাসনের এরূপ দু’একটি উদাহরণ পেশ করা হল।

৩৪. মানবতার নবী হযরত মুহাম্মদ (ﷺ), পৃ. ৩১।

৩৫. সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত ২৫৬।

অমুসলিমদের অধিকার রক্ষাতেও ইসলামী আইন সমানভাবে যত্নবান। হিফযীনের যুদ্ধের সময় হযরত আলী (রাঃ)-এর বর্ম হারিয়ে গেলে পরে তিনি তা এক খৃষ্টানের কাছে পান। তাকে নিয়ে কাযী গুরাইহ-এর নিকট বিচারের জন্য এসে বলেন, এটি আমার বর্ম। আমি এটি বিক্রিও করিনি এবং কাউকে দানও করিনি। গুরাইহ তখন ঐ খৃষ্টান লোকটিকে বললেন, আমীরুল মুমিনীনের বক্তব্য সম্পর্কে তোমার মতামত কী? লোকটি বলল,

বর্মটি আমার। তবে আমীরুল মুমিনীন মিথ্যা বলেননি। একথা শুনে বিচারক আলী (রাহিমাহা-এ) -এর দিকে তাকিয়ে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনার কাছে কোন প্রমাণ আছে কী? আলী (রাহিমাহা-এ) হেসে বললেন, না; কোন প্রমাণ নেই। তখন বিচারক ঐ বর্মটি খুঁটান লোকটিকে দিয়ে দিলেন। লোকটি তখন বর্মটি নিয়ে এক ধাপ অগ্রসর হয়ে ফিরে এসে বলল, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, এটিই নবীদের বিচার। আমীরুল মুমিনীন আমাকে তাঁর অধীনস্থ বিচারকের নিকট নিয়ে গেলেন, আর বিচারক তাঁরই বিরুদ্ধে রায় দিলেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাঁর বান্দা ও রাসূল। (অর্থাৎ তিনি মুসলমান হয়ে গেলেন)। হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহর কসম! বর্মটি আপনার। হিফফীনের দিকে যাত্রার সময় এটি আপনার উটের উপর থেকে পড়ে গিয়েছিল। আলী (রাহিমাহা-এ) বললেন, তুমি যেহেতু ইসলাম গ্রহণ করলে, সেহেতু এটি তোমার জন্য। এরপর খলীফা তাকে স্বীয় ঘোড়ায় আরোহণ করিয়ে নিয়ে গেলেন।^{৩৭}

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ مُسْلِمًا وَيَهُودِيًّا اخْتَصَمَا إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَرَأَى الْحَقَّ لِلْيَهُودِيِّ فَقَضَى لَهُ عُمَرُ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ لَقَدْ قَضَيْتَ بِالْحَقِّ فَضْرَبَهُ عُمَرُ بِالْذَّرَةِ وَقَالَ وَمَا يُدْرِيكَ فَقَالَ الْيَهُودِيُّ وَاللَّهِ إِنَّا نَجِدُ فِي التَّوْرَةِ لَيْسَ قَاضٍ يَقْضِي بِالْحَقِّ إِلَّا كَانَ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكٌ وَعَنْ شِمَالِهِ مَلَكٌ يُسَدُّ دَانَهُ وَيُوقِفَانِهِ لِلْحَقِّ مَا دَامَ مَعَ الْحَقِّ فَإِذَا تَرَكَ الْحَقَّ عَرَجَا وَتَرَكَاهُ.

সাইদ ইবনুল মুসাইয়িব হতে বর্ণিত আছে যে, এক মুসলমান ও এক ইহুদী নিজেদের ঝগড়া নিয়ে ওমর (রাহিমাহা-এ) -এর নিকট আসল। তিনি ইহুদীর দাবী সত্য দেখে তার পক্ষে ফায়সালা দিলেন। তখন ইহুদী বলল, আল্লাহর শপথ! আপনি সত্য ফায়সালা দিয়েছেন। একথা শুনে ওমর (রাহিমাহা-এ) তাকে বেত্রাঘাত করে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কিভাবে এটা সত্য বলে জানলে? ইহুদী উত্তর দিল, আল্লাহর শপথ, আমরা তাওরাতে পাই যে, কোন বিচারক সত্য ও সঠিক ফায়সালা করলে তার ডান ও বাম পার্শ্বে দুই ফেরেশতা থাকে- যারা তাকে ঠিক পথে পরিচালিত করে এবং সত্যের

ক্ষমতা দান করে- যতক্ষণ বিচারক সত্য নীতিতে অটল থাকে। আর যখন সে সত্য নীতি বর্জন করে তখন তারা তাকে ছেড়ে আকাশে চলে যায়।^{৩৮} এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, স্বয়ং রাসূল (ﷺ) ও তাঁর সাহাবীগণ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি অমুসলিমদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কতটুকু সোচ্চার ছিলেন। এমনিভাবে যুগে যুগে ইসলামী আইনে মানুষ হিসেবে সকল নাগরিকের অধিকার সমভাবে রক্ষা ও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বর্তমান বসুন্ধরা অসংখ্য ধর্মের কোটি কোটি অনুসারীর পদভারে মুখরিত। কিন্তু এমন একটি ধর্মও খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে কি নৈতিক কি ব্যবহারিক কোন ক্ষেত্রেই মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ ইসলামের চেয়ে বেশি। বরং ইসলামই একমাত্র ধর্ম যেখানে মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে মানবীয় মর্যাদাবোধ ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের বিষয়টি নৈতিক ও ব্যবহারিক প্রতিটি ক্ষেত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। যা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) বর্ণনা করে গেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَا ابْنَ آدَمَ! مَرَضْتُ فَلَمْ تُعْذِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَعُوذُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ عَبْدِي فَلَانًا مَرَضَ فَلَمْ تُعْذِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ عُدْتَهُ لَوْجَدْتَنِي عَنْدهُ؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَطَعَمْتُكَ فَلَمْ تُطْعِمْنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَطْعِمُكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّهُ اسْتَطَعَمَكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُطْعِمْهُ؟ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ أَطْعَمْتَهُ لَوْجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي؟ يَا ابْنَ آدَمَ! اسْتَسْقَيْتُكَ فَلَمْ تُسْقِنِي. قَالَ: يَا رَبِّ! كَيْفَ أَسْقِيكَ وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ؟ قَالَ: اسْتَسْقَاكَ عَبْدِي فَلَانٌ فَلَمْ تُسْقِهِ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّكَ لَوْ سَقَيْتَهُ وَجَدْتُ ذَلِكَ عِنْدِي.

আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, হে আদম সন্তান! আমি পীড়িত হয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি। সে বলবে, হে আমার

প্রতিপালক! আমি কিভাবে তোমাকে দেখতে আসব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রভু? আল্লাহ বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা পীড়িত হয়েছিল? কিন্তু তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে নিশ্চয়ই তার নিকট আমাকে পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট খানা চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খানা দাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে খানা দিব, অথচ তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট খানা চেয়েছিল, আর তুমি তাকে খানা দাওনি? তুমি কি জানতে না যে, যদি তুমি তাকে খানা দিতে, নিশ্চয়ই তা আমার নিকট পেতে? হে আদম সন্তান! আমি তোমার নিকট পানি চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পানি পান করাওনি। সে বলবে, হে আমার প্রভু! আমি তোমাকে কিরূপে পানি পান করাব, যখন তুমিই সমস্ত জগতের প্রতিপালক? তিনি বলবেন, আমার অমুক বান্দা তোমার নিকট পানি চেয়েছিল, কিন্তু তুমি তাকে পানি পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে পানি পান করাতে, তুমি সেখানে আমাকে পেতে?''^{৩৯} অত্র হাদীছটির কাব্যানুবাদ করেছেন কবি আব্দুল কাদির। তিনি তার কবিতার নাম দিয়েছেন 'মানুষের সেবা'। কবিতাটি নিম্নরূপ :

হাশরের দিন বলিবেন খোদা, 'হে আদম-সন্তান,
তুমি মোরে সেবা কর নাই যবে ছিনু রোগে অজ্ঞান'।
মানুষ বলিবে, 'তুমি প্রভু করতার,
আমরা কেমনে লইব তোমার পরিচর্যার ভার?'
বলিবেন খোদা, 'দেখনি মানুষ কেঁদেছে রোগের ঘোরে,
তারি গুশ্রুয়া করিলে তুমি যে সেথায় পাইতে মোরে'।
খোদা বলিবেন, 'হে আদম-সন্তান,
আমি চেয়েছি নু ক্ষুধার অনু, তুমি কর নাই দান'।
মানুষ বলিবে, 'তুমি জগতের প্রভু,
আমরা কেমনে খাওয়াব তোমারে, সে কাজ কি হয় কভু?'
বলিবেন খোদা, 'ক্ষুধিত বান্দা গিয়েছিল তব দ্বারে,
মোর কাছে তুমি ফিরে পেতে যদি খাওয়াইতে তারে'।
পুনরায় খোদা বলিবেন, 'শোন হে আদম-সন্তান,
পিপাসিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি করাওনি জলপান'।

মানুষ বলিবেন, ‘তুমি জগতের স্বামী,
তোমারে কেমনে পিয়াইব বারি, অধম বান্দা আমি?’
বলিবেন খোদা, ‘তৃষ্ণার্ত তোমায় ডেকেছিল জল আশে,
তারে যদি জল দিতে তুমি, তবে পাইতে আমায় পাশে’।

এ হাদীছ থেকে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে, বর্ণিত তিনটি বিষয়েই কিয়ামতের দিন প্রতিটি বনু আদম আল্লাহর নিকটে জিজ্ঞাসিত হবে। উল্লিখিত ব্যক্তিদের পক্ষাবলম্বন করে মহান আল্লাহ মানুষকে পাকড়াও করবেন। আরও স্পষ্ট যে, সৃষ্টির প্রতি দয়া প্রদর্শনের মাধ্যমে স্রষ্টার সম্ভ্রুতি অর্জন করা সম্ভব। বর্ণিত হাদীছে পীড়িত, ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত এই তিন ব্যক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। এ কারণে অন্যান্য বিষয়ের সাথে উক্ত তিনটি বিষয় রাসূল (ﷺ) ও অত্যধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি উক্ত বিষয়ে শুধু তাঁর সঙ্গী-সাথীদেরকে বলেননি, নিজেও তা মেনে চলেছেন। যার বাস্তব প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবনে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে বলা হয়েছে, একদা রাসূল (ﷺ) একজন রোগাক্রান্ত বেদুঈনকে দেখতে গেলেন। শুধু তাই নয়, অন্যান্য রোগী দেখতে যাওয়ার সাধারণ নিয়মানুসারে তিনি তাকেও বললেন, ‘لَبَّاسٌ طَهُورٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ’ ‘ভয় নেই! আল্লাহ চাহেতো দ্রুত আরোগ্য লাভ করবে’।^{৪০} অপর এক হাদীছে আছে, বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে নির্দেশ এবং সাতটি বিষয়ে নিষেধ করেছেন। নির্দেশ প্রদানকৃত সাতটি বিষয়ের প্রথমটিই হল রোগীর পরিচর্যা করা’।^{৪১}

শুধু রোগী দেখা বা পীড়িতকে সেবা করার ক্ষেত্রেই নয়, বিশ্বভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির অন্যতম নিয়ামক ক্ষুধার্তকে অনু দানের ক্ষেত্রেও ইসলাম উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে, যা নিম্নোক্ত হাদীছ থেকে সহজেই অনুমেয়।

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالَّذِي يَشْبَعُ وَجَارُهُ جَائِعٌ إِلَى جَنْبِهِ.

৪০. বুখারী, মিশকাত, হাদীছ নং ১৫২৯।

৪১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ১৫২৬।

উৎসাহ দেয় না'।^{৪৫} অর্থাৎ ধীনকে শুধু মুখে অস্বীকারকারীই ক্ষতিগ্রস্ত নয়, যারা ধীনের বিধান অমান্য করে অর্থাৎ ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্তকে সহায়তা করে না তারা মুখে যতই ধীনের স্বীকৃতি দিক, নিজকে মুসলমান বলে দাবী করুক, প্রকৃতপক্ষে তারাও ধীনের বিধান অস্বীকারকারী। এ কারণেই অন্তত প্রত্যেক মুসলমানের উচিত, যে কোন ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী অনু দান করা, সাথে সাথে যাদের সামর্থ্য আছে তাদেরকেও অনু দানে উৎসাহ প্রদান করা। আর এটাই আল্লাহর হুকুম। মহান আল্লাহ অন্যত্র বলেন, *وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ* 'আর ধনীদের সম্পদে ফকীর ও বঞ্চিতদের অধিকার আছে'।^{৪৬} এ হুকুম-আহকাম যথাযথভাবে প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে ধনী ও গরীবের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কে গড়ে উঠবে।

ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার অন্যতম নিয়ামক হল যাকাত। যে বিষয়ে মহান আল্লাহ সূরা তওবায় উল্লেখ করেছেন,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'নিশ্চয়ই যাকাত কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী, যাদের চিন্তা আকর্ষণ প্রয়োজন, দাস-মুক্তি, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহর রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।^{৪৭}

অত্র আয়াতে যাকাত প্রদানের আটটি খাতের মধ্যে *وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ* অর্থাৎ 'যাদের চিন্তা আকর্ষণ প্রয়োজন' বলে যে খাতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্যই প্রযোজ্য। এর মাধ্যমে একটি বিষয় সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, উদ্দেশ্য যাই থাক না কেন, ইসলাম ধর্মে ধন বন্টনের ক্ষেত্রে বন্টনযোগ্য মোট সম্পদের একটা বড় অংশ শুধুমাত্র অমুসলিমদের জন্য নির্ধারিত।

বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় মহানবী যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গেছেন, সে কথার উল্লেখ করে বাংলার বহু কবি আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নানা রকম কবিতা

৪৫. সূরা মাউন, আয়াত ১-৩।

৪৬. সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত ১৯।

৪৭. সূরা আত-তওবা, আয়াত ৬০।

বিশ্বভ্রাতৃত্বের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল জাতি, ধর্ম বা বর্ণের বেড়াঝাল ছিন্ন করে মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে ধনী-গরীবের বৈষম্য দূরীভূত করে সকলে এক আদমের সন্তান হিসেবে ভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সুখে-শান্তিতে বসবাস করা। একই সাথে যেহেতু পৃথিবীর সকল মানুষ আল্লাহর সৃষ্টি, সেহেতু সকলেই তাঁর প্রেরিত অহির বিধান মেনে চলবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। বর্তমান বিশ্ব পরিসংখ্যানে মুসলমানের তুলনায় অমুসলমানের সংখ্যাই বেশি। ২০০৭ সালের হিসাব অনুযায়ী বিশ্বে খৃষ্টান জনসংখ্যা ২১৯ কোটি ৯৮ লক্ষ ১৭ হাজার ৪শ', মুসলমান জনসংখ্যা ১৩৮ কোটি ৭৪ লক্ষ ৫৪ হাজার ৫শ', হিন্দু ৮৭ কোটি ৫৭ লক্ষ ২৬ হাজার, বৌদ্ধ ৩৮ কোটি ৫৬ লক্ষ ৯ হাজার, শিখ ২ কোটি ২৯ লক্ষ ২৭ হাজার ৫শ' এবং ইহুদী জনসংখ্যা ১ কোটি ৪৯ লক্ষ ৫৬ হাজার।^{৪৮}

এ সকল আল্লাহ-বিমুখ মানুষের নিকটে অহির বিধান পৌছে দিতে তাদের সংস্পর্শে যাওয়া বা তাদেরকে নিজের সংস্পর্শে আনা একান্ত প্রয়োজন। যা পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে সহজ ও সম্ভব হবে। রাসূলে আকরাম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সাথে মক্কার কাফেরদের কৃত হৃদয়বিয়ার সন্ধিই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। হৃদয়বিয়ার সন্ধির চুক্তির বেশিরভাগ শর্ত বাহ্যত মুসলমানদের বিপক্ষে ছিল। সে কারণে প্রসিদ্ধ ছাহাবীগণ এ চুক্তি সম্পাদনে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু দূরদর্শী ও বিচক্ষণ রাষ্ট্রনায়ক হযরত মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) দেখলেন, চুক্তির শর্ত যাই থাক না কেন, এর মাধ্যমে যদি আমরা তাদের (কাফের) সংস্পর্শে যাওয়ার সুযোগ পাই তাহলেই আমরা সফল। কার্যত সেটাই হয়েছিল। অবশেষে দেখা গেল হৃদয়বিয়ার সন্ধির পথ ধরেই মুসলমানরা অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে মক্কা বিজয় করতে সক্ষম হল। যে বিজয়কে মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে ‘ফাত্‌হু মুবীন’^{৪৯} তথা মহাবিজয় বলে আখ্যায়িত করেছেন। অর্থাৎ ইসলামী শরী‘আতে বিশ্বভ্রাতৃত্বের

এ সকল হুকুম বিধমীদের নিকটে আল্লাহর একত্ব প্রচারের লক্ষ্যে তাদেরকে কাছে পাওয়ার ক্ষেত্রে একটা স্থায়ী হিকমত বলা যেতে পারে। তবে একটা বিষয় কোন অবস্থাতেই ভুলে গেলে চলবে না যে, একজন ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের সাথে কোন অবস্থাতেই একজন মুসলমানের সত্যিকারের বন্ধুত্ব হতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ.

‘মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তো তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ যে সত্য তোমাদের কাছে আগমন করেছে, তারা তা অস্বীকার করেছে ...’।^{৫০} তিনি আরো বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ.

‘হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদেরকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। নিশ্চয়ই আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না’।^{৫১} অর্থাৎ মানবীয় ভ্রাতৃত্ববোধ এবং আন্তরিক বন্ধুত্ব কোন অবস্থাতেই এক বিষয় নয়।

মোটকথা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণের প্রথম কাজ হল তাকে সংস্পর্শে পাওয়া। আর কাছে পাওয়ার অন্যতম পদ্ধতি হল ভাল আচরণ, আর্থিক সহযোগিতা, সুপরামর্শ, প্রয়োজনে মানবিক সহায়তা প্রদান ইত্যাকার কাজের মাধ্যমে তাদের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া। এভাবে তাদের মাঝে সৃষ্টিকর্তার বিধান প্রচার করা সহজ হবে। আর এটিই হল বিশ্বভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য।

□ ইসলামী ভ্রাতৃত্ব :

সমাজে বসবাসকারী মানব সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃসুলভ আচরণ করা এবং একে অন্যের সুখ-দুঃখে সাথী হয়ে সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, হৃদয়তাপূর্ণ ও বন্ধুত্বসুলভ অনুপম সম্পর্ক বজায় রাখার নাম ভ্রাতৃত্ব। আর ইসলামী আন্দোলনের সর্বস্তরের অনুসারীদের মধ্যে তথা সকল মুসলমানের মধ্যে এরূপ সম্পর্ক বজায় থাকার নাম ‘ইসলামী ভ্রাতৃত্ব’। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব মূলত আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব। যারা তাওহীদ, রিসালাত ও আখেরাতে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর পসন্দনীয় ধর্ম ইসলামের বিধি-বিধান ও অনুশাসন মেনে চলে সার্বিক অর্থে তারা সকলেই ইসলামী আন্দোলনের একেকজন মর্দে মুজাহিদ তথা কর্মী। তারা বিশ্বের যেকোন অঞ্চলের অধিবাসী হোক, যেকোন ভাষাভাষী হোক, যেকোন বংশ বা গোত্রে জন্মগ্রহণ করুক, তাদের আকার-আকৃতি, বর্ণ বা আর্থিক অবস্থা যাই থাক না কোন, তারা মুসলমান এবং পরস্পর ভাই ভাই। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর ঘোষণা, **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ** মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমার দুই ভাইয়ের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে এবং আল্লাহকে ভয় করবে, সম্ভবত তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হবে’।^{৫২} তিনি আরো বলেন,

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَتَكَبَّرُونَ فُضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا।

‘মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর, (আর) নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকু ও সেজদারত দেখবেন’।^{৫৩} মহানবী (ﷺ) ও বলেছেন, **أَخُو الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ** ‘এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই’।^{৫৪}

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বাস্তব এবং শ্রেষ্ঠ রূপকার হলেন বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)। মহানবীর আবির্ভাবের পূর্বে বিশেষ করে আরবের সামাজিক অবস্থা ছিল অত্যন্ত শোচনীয়। খুঁটিনাটি বিষয়কে কেন্দ্র করে ভাইয়ে-ভাইয়ে, গোত্রে-গোত্রে মারামারি, রক্তপাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, হিংসা-

৫২. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০।

৫৩. সূরা আলা-ফাতহ, আয়াত ২৯।

৫৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৮, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির প্রতি দয়া’ অনুচ্ছেদ।

হানাহানি লেগেই থাকত। একে অন্যের নিকটে মানবীয় সম্মানবোধের কোন বালাই ছিল না। বিশেষত নারী এবং কৃতদাসদের অবস্থা ছিল খুবই শোচনীয়। তাদেরকে পশুর মত হাটে-বাজারে বিক্রি করা হত। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে মহান আল্লাহর অশেষ রহমতে মহানবী (ﷺ)-এর প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সেই অসভ্য বর্বর জাহেলি সমাজ অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে সোনার সমাজে পরিণত হয়ে গেল। দু'দিন আগেও যারা একে অন্যের মুখ দেখতে চাইত না, আজ তারা সেই পড়শির বিপদে নিজের জীবন দিয়ে হলেও তাকে সাহায্য করে বিপদমুক্ত করতে প্রস্তুত। এ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিক খোদাবক্স তাঁর Mohammad the Prophet গ্রন্থে বলেন,

The immediate result of the prophet's teaching was the dissolution of tribal system and the foundation of the brotherhood of Islam. 'মহানবী (ﷺ)-এর শিক্ষার প্রত্যক্ষ ফল হল গোত্রভিত্তিক সমাজের বিলুপ্তি ও ইসলামী ভ্রাতৃত্ব স্থাপন'।

অহির বিধান পৃথিবীতে বিরাজমান সর্বপ্রকার শত্রুতা, বিভেদ ও বৈষম্য বিদূরিত করে দুনিয়ার সকল মানুষকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বে অন্তর্ভুক্ত করে শান্তির মৃদুমন্দ সমীরণ প্রবাহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

وَذَكِّرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا.

‘তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর। তোমরা পরস্পর শত্রু ছিলে, (ইসলাম গ্রহণের পর) আল্লাহ তোমাদের হৃদয়ে সম্প্রীতির সঞ্চারণ করে দিয়েছেন। ফলে আল্লাহর অনুগ্রহে তোমরা ভাই ভাই হয়ে গেছ। তোমরা তো অগ্নিকুণ্ডের কিনারে অবস্থান করছিলে, আল্লাহ সেখান থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন’।^{৫৫}

ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যেহেতু আদর্শিক ভ্রাতৃত্ব, সেহেতু পৃথিবীর যেকোন প্রান্তে যেকোন বর্ণের মানুষ ইসলাম ধর্মের মহামন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলে সে বিশ্বজনীন ‘ইসলামী ভ্রাতৃসংঘের’ সদস্য হয়ে যায়। এ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি এত মজবুত যে, এর আকর্ষণে দেশ, বংশ বা রক্তের সম্পর্কও ঠুনকো হয়ে যায়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ব যেমন মজবুত ও সুদৃঢ়, তেমনি মহান ও পবিত্র।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের উদ্দেশ্য

দুনিয়া ও আখেরাতে শান্তি দানকারী ইসলাম ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক মুসলমান তথা ইসলামী আন্দোলনের কর্মীকে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য তথা অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। তা না হলে তার পক্ষে ইসলামের পরিপূর্ণ রূপ ও পূর্ণাঙ্গ সফলতা লাভ করা আদৌ সম্ভবপর নয়। ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য হল আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহির বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তার সন্তুষ্টি অর্জন করা। সে লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কাজ অতীব জরুরী।

১. তাওহীদ প্রতিষ্ঠা :

ইসলামী শরী‘আতের মূল বিষয় হল তাওহীদ। তাওহীদ শব্দের অর্থ একত্ব। আদি পিতা হযরত আদম(عليه السلام) থেকে শুরু করে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ মোস্তফা(صلي الله عليه وسلم) পর্যন্ত পৃথিবীতে যত নবী এবং রাসুলের আগমন ঘটেছে, তাঁদের সকলেরই দাওয়াতের মূল বিষয় ছিল **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ‘আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য মাবুদ নেই’। অর্থাৎ আল্লাহর একত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

‘তিনি তোমাদের জন্য ধর্মের ক্ষেত্রে সে পথই নির্ধারণ করেছেন, যার আদেশ দিয়েছিলেন নূহকে; যা আমি প্রত্যাদেশ করেছি আপনার প্রতি এবং যার আদেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মুসা ও ঈসাকে এই মর্মে যে, তোমরা ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত কর এবং তাতে অনৈক্য সৃষ্টি কর না’।^{৫৬} এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, পৃথিবীর শুরু অর্থাৎ হযরত আদম(عليه السلام) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী ও রাসুলের দাওয়াতের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য ছিল না।

অত্র আয়াতে ‘ইক্বামতে দ্বীন’ বলতে তাওহীদ এবং আল্লাহ্র আনুগত্যপূর্ণ সকল কাজকে বুঝানো হয়েছে। অনেকে ‘দ্বীন প্রতিষ্ঠা’র অর্থ ‘হুকুমত প্রতিষ্ঠা’ করে থাকেন, যেটা সর্বৈব ভ্রান্ত ব্যাখ্যা। আল্লাহ তাআলা দুনিয়াব্যাপী মুশরিক সমাজকে লক্ষ্য করে এরশাদ করেন যে, তোমাদের জন্য তোমাদের প্রভু নির্ধারণ করেছেন সেই দ্বীন যা তিনি নির্ধারণ করেছিলেন দুনিয়ার প্রথম রাসূল হযরত নূহ(عليه السلام)-এর উপর। অতঃপর শ্রেষ্ঠ রাসূলগণের মধ্যে ইবরাহীম, মূসা, ঈসা ও সর্বশেষ রসূল মুহাম্মাদ(ﷺ)-এর উপরে। আর সেটা হল, এককভাবে আল্লাহ্র ইবাদত করা ও তাঁর সাথে অন্য কাউকে শরীক না করা।^{৫৭} বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে মহান আল্লাহ অন্যত্র রাসূল(ﷺ)-কে বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيْهِ إِلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ। ‘আমি আপনার পূর্বকার সকল রসূলের নিকটে একই বিষয় প্রত্যাদেশ করেছি যে, আমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কেবলমাত্র আমারই এবাদত কর’।^{৫৮}

সকল নবী-রাসূলের দাওয়াত ও আদর্শের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার মৌলিকতা ও অভিন্নতা প্রসঙ্গে রাসূল(ﷺ) নিজেও বলেন, الْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ مِنْ عِلَاقَاتٍ، ‘নবীগণ পরস্পরে বৈমাত্রেয় ভাই। তাঁদের মায়েরা পৃথক। কিন্তু তাঁদের সকলের দ্বীন এক’।^{৫৯} উল্লিখিত আয়াত ও হাদীছের বিবরণ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হয় যে, প্রত্যেক নবী-রাসূলের দায়িত্ব ছিল মূলত এক ও অভিন্ন। তাহল তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্বের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তাওহীদ তিন প্রকার। তাওহীদে রুবুবিয়াত (রব হিসেবে একত্ব), তাওহীদে আসমা ওয়া সিফাত (নাম ও গুণাবলীর একত্ব) এবং তাওহীদে উলুহিয়াত (ইবাদতে একত্ব)।

আমরা শেষ নবীর উম্মত হওয়ায় তাঁর তিরোধানের পর তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার সেই গুরু দায়িত্ব এখন প্রত্যেক মুসলমানের উপর অর্পিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাসূল(ﷺ) বলে গেছেন,

৫৭. মুহাম্মাদ আসালাদুল্লাহ আল-গালিব, ইক্বামতে দ্বীন : পথ ও পদ্ধতি, হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, রাজশাহী, ২০০৪, পৃ. ৪।

৫৮. সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত ২৫।

৫৯. বুখারী, মুসলিম, হাদীছ নং ২৩৬৫, ‘ঈসা(عليه السلام)-এর ফাযায়েল’ অধ্যায়, মিশকাত-আলবানী, হাদীছ নং ৫৭২২, ‘ক্বিয়ামতের অবস্থা ও সৃষ্টির সূচনা’ অধ্যায়।

وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوْرَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، وَإِنَّمَا وَرَثَتُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطٍّ وَافٍ.

‘আলেমগণ হলেন নবী-রাসূলগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ টাকা-পয়সার উত্তরাধিকারী করেন না; বরং তাঁরা জ্ঞানের উত্তরাধিকারী করেন। কাজেই যে ব্যক্তি সেই জ্ঞান অর্জন করল, সে পরিপূর্ণ অংশ গ্রহণ করল’।^{৬০}

বর্তমান বিশ্বে আল্লাহর একত্ব বিপরীতে বহুঈশ্বরবাদ এমনভাবে সুসংগঠিত ও ব্যাপকভাবে সমাজমূলে শিকড় গেড়ে বসে গেছে, যা আইয়ামে জাহেলিয়ার যুগকেও হার মানিয়ে দিয়েছে। অপর দিকে মুসলিম সমাজেও সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর একত্ব নিয়ে নানা রকম ভ্রান্ত আকীদার অনুপ্রবেশ ঘটেছে। তিন প্রকার তাওহীদের মাধ্যে রব হিসেবে একত্ব অথবা নাম ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে আল্লাহকে এক হিসেবে বিশ্বাস করলেও তাওহীদে উলূহিয়াত অর্থাৎ মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে একমাত্র তাঁরই দাসত্ব করতে হবে এক্ষেত্রে বহুলাংশে দ্বিমত বা অনিহা পরিলক্ষিত হয়। এমনিতর বহুমুখী সুসংঘবদ্ধ জাহেলিয়াতের মুকাবেলায় সমাজে নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে ইসলামী ভ্রাতৃত্বের বিকল্প নেই।

২. বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তোলা :

ইসলাম ভাষা, বর্ণ, ভৌগলিক সীমারেখা, ধনী-গরীবের বৈষম্য ইত্যাদির উর্দ্ধে উঠে বিশ্বমুসলিম ঐক্যে বিশ্বাসী। মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে উম্মতে মুহাম্মাদী তথা সমগ্র মুসলিম জাতিকে ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁর প্রেরিত বিধানকে আঁকড়ে ধরার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। সাথে সাথে মুসলমানরা যাতে আপোষে দল-বিভক্তির কবলে পড়ে নিজেদের শক্তিকে বিনষ্ট না করে, সে জন্যও কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ারি উচ্চারিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, **وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ** ‘তোমরা ঐক্যবদ্ধভাবে আল্লাহর রজুকে আঁকড়ে ধর। সাবধান! দলে দলে বিভক্ত হয়ো না’।^{৬১}

তিনি আরো বলেন,

৬০. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৬৮২; আব্দাউদ, হাদীছ নং ৩৬৪১; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ২২৩; মিশকাত, হাদীছ নং ২১২ ‘ইলম’ অধ্যায়, হাদীছ হুহীহ।

৬১. সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১০৩।

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَّسْتُ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ.

‘নিশ্চয় যারা স্বীয় ধর্মকে খণ্ড-বিখণ্ড করেছে এবং বহু দলে বিভক্ত হয়েছে, তাদের সাথে আপনার কোনই সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপার আল্লাহর নিকট সমর্পিত’।^{৬২}

একই সাথে রাসূল (ﷺ) নিজেও একমাত্র তাঁরই আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর ঐক্য সুদৃঢ় রাখা এবং এরই মাধ্যমে পরকালে জান্নাত লাভের সুসংবাদ দিয়ে গেছেন। যেমন নিম্নোক্ত হাদীছে তিনি বলেন,

وَأَنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ ثَلَاثِينَ وَسَبْعِينَ مَلَّةً، وَتَفَرَّقَ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مَلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مَلَّةً وَاحِدَةً. قَالُوا: مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي.

‘নিশ্চয়ই বনী ইসরাঈলগণ ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল, আর আমার উম্মাত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। এদের সব দলই জাহান্নামে যাবে একটি দল ব্যতীত। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, সে দল কোনটি? রাসূল (ﷺ) বললেন, আমি ও আমার সাহাবাগণ যে আদর্শের উপরে আছি, তার উপরে যে দল থাকবে’।^{৬৩}

বিশ্বের সকল মুসলমানের প্রভু এক, রাসূল এক, বিধান এক, কেবলা এক। সুতরাং তারা জাতিতেও এক। অথচ বাস্তবতায় তা পরিলক্ষিত হয় না। এক দেশের মুসলমানের সাথে অন্য দেশের মুসলমানের কোন মিল নেই। পারস্পরিক সহযোগিতা তো দূরের কথা, অনেক ক্ষেত্রে একে অন্যের ক্ষতি সাধনে ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন। এহেন পরিস্থিতিতে বিশ্বের সকল মুসলমানের সমস্ত প্রকার বিভেদ ও মতপার্থক্য দূর করে ঐক্যবদ্ধ মুসলিম মিল্লাত গড়ে তুলতে প্রয়োজন পারস্পরিক সহমর্মিতা, হৃদয়তা ও বন্ধুত্ব। এক কথায় বিশ্বব্যাপী বৃহত্তর মুসলিম ঐক্য গড়ে তুলতে প্রয়োজন মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করা।

৩. মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি অর্জন :

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আর একটি উদ্দেশ্য হল সার্বিক অর্থে মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি আনয়ন করা। সমাজের পুঞ্জীভূত সমস্যা সমাধানে আর্থিক উন্নতি এবং সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তির কোন বিকল্প নেই। রক্ত ছাড়া যেমন

‘তোমরা তাদের মুকাবেলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ব-বাহিনী প্রস্তুত রাখবে, এল্লারা তোমরা আল্লাহর শত্রুদের ও তোমাদের শত্রুদের সম্ভ্রান্ত করবে এবং এতদ্ব্যতীত অন্যদেরকে, যাদের তোমরা জান না; কিন্তু আল্লাহ জানেন’। ৬৪

বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিরোধী শক্তিগুলো আল্লাহদ্রোহিতার ক্ষেত্রে আপোষে সকল প্রকার মতভেদ ভুলে সম্ভবত্বভাবে ইসলাম ও মুসলমানদের ধ্বংসের লক্ষ্যে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে চলেছে। খৃষ্টান, বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে কোন মিল না থাকলেও যেকোন মুসলিম রাষ্ট্রে তারা ‘হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ’ বা অন্যান্য নামে সম্মিলিতভাবে কাজ করছে। সে তুলনায় বিশ্বের মুসলমানরা অনেকাংশে পিছিয়ে আছে। তাই ঐক্যবদ্ধ তান্ত্রিকী অপশক্তির মুকাবেলায় মুসলিম সমাজে চাই ভ্রাতৃত্ববোধের উন্মোচন। অপর দিকে যদি মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের ঘাটতি থাকে, তাহলে শত্রুপক্ষ যেকোন মুহূর্তে তাদের ঘায়েল করতে কুণ্ঠাবোধ করবে না। তাই মুসলিম মিল্লাতের সমৃদ্ধি অর্জনে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির কোন বিকল্প নেই।

প্রত্যেক মুসলমানের মূল এবং একমাত্র উদ্দেশ্য হল পারলৌকিক মুক্তি অর্জন করা। পরকালীন মুক্তির মূলে আছে আল্লাহর সন্তুষ্টি। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম পথ হল নিঃস্বার্থভাবে মানবতার সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগ করা। কোন মানুষের প্রতি সেবা বা সহযোগিতার মানসিকতা তখনই সৃষ্টি হয়, যখন তার প্রতি হৃদয়ের গভীর থেকে এক ধরনের আন্তরিক

ভালবাসা জাগ্রত হয়। সে ভালবাসার মূল উদ্দেশ্য হবে পরকালীন মুক্তি, দুনিয়াবী কোন স্বার্থ নয়। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَجِبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَحَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ.

মু'আয ইবনে জাবাল (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, 'যারা আমার সম্ভ্রুতি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পরকে ভালবাসে, আমার উদ্দেশ্যে সমাবেশে মিলিত হয়, আমার উদ্দেশ্যে পরস্পরে সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই নিজেদের মাল-সম্পদ ব্যয় করে; আমার ভালবাসা তাদের জন্য অবধারিত'।^{৬৫} অর্থাৎ পারস্পরিক ভালবাসা, কোথাও সমবেত হওয়া বা সাক্ষাৎ করা অথবা কারো জন্য কিছু অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে অবশ্যই খালেছ নিয়ত থাকতে হবে। এ সকল কাজ একমাত্র আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের উদ্দেশ্যেই হতে হবে। দুনিয়াবি কোন স্বার্থে নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّونَ بِحِلَالِي؟ الْيَوْمَ أَظْلَهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلِّي.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, আমার সুমহান ইজ্জতের খাতিরে যারা পরস্পরে ভালবাসা স্থাপন করেছে, তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে আমার বিশেষ ছায়ায় স্থান দিব। আজ আমার ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া নেই'।^{৬৬} এখানেও কিয়ামতের ভয়াবহতম পরিস্থিতিতে তারাই কেবল আল্লাহর রহমতের ছায়তলে আশ্রয়প্রাপ্ত হবেন, যারা আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের লক্ষ্যে মানুষের সাথে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হবেন।

আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের উদ্দেশ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি স্থাপনের বিষয়ে অন্য একটি হাদীছে আরো স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مَذْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ : أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ :

أُرِيدُ أَحَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا؟ قَالَ: لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ قَالَ فَإِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتُهُ فِيهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) নবী (সঃ) হতে বর্ণনা করেন, ‘এক ব্যক্তি অন্য এক গ্রামে তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে বের’ হল। আল্লাহ তা‘আলা তার গমন পথে একজন অপেক্ষমান ফেরেশতা বসিয়ে রাখলেন। লোকটি যখন সেখানে পৌঁছাল তখন ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? সে বলল, ঐ গ্রামে একজন ভাই আছে, তার সাথে সাক্ষাতে যাচ্ছি। ফেরেশতা জিজ্ঞেস করলেন, তার কাছে তোমার কি কোন চাওয়ার আছে, যা পাওয়ার জন্য তুমি যাচ্ছ? সে বলল, না; আমি তাকে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে ভালবাসি। তখন ফেরেশতা বললেন, আমি আল্লাহ তা‘আলার পক্ষ থেকে তোমার কাছে এই সংবাদ দেওয়ার জন্য প্রেরিত হয়েছি যে, আল্লাহ তোমাকে অনুরূপ ভালবাসেন, যে রূপ তুমি আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তাকে ভালবাস’।^{৬৭} তিনি আরো বলেন,

عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لِلنَّاسِ مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ، يَغِطُّهُمْ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ. قَالُوا: يَارَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ، وَلَا أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا، فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ لَعَلَى نُورٍ، لَا يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ، وَلَا يَحْزَنُونَ إِذَا حَزَنَ النَّاسُ، وَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

‘হযরত আমর (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীও নন এবং শহীদও নন। কিন্তু কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা‘আলার কাছে তাদের মর্যাদা দেখে নবী-শহীদগণও ঈর্ষা করবেন। সাহাবাগণ আরজ করলেন, ইয়া রাসূল্লাহ! আমাদেরকে বলুন তারা কারা? তিনি বললেন, তারা এমন এক সম্প্রদায় যারা শুধু আল্লাহর রুহ (কুরআনের সম্পর্ক) দ্বারা পরস্পরকে ভালবাসে। অথচ তাদের মধ্যে কোন প্রকার আত্মীয়তা নেই এবং তাদের পরস্পরে

মাল-সম্পদের লেন-দেনও নেই। তাদের চেহারা হবে জ্যোতির্ময় এবং তারা উপবিষ্ট হবেন নূরের উপর। তারা ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না, যখন সমস্ত মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না, যখন সকল মানুষ দুশ্চিন্তায় নিমগ্ন থাকবে। অতঃপর তিনি কুরআনের একটি আয়াত পড়েন, জেনে রাখ! নিশ্চয় আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না'।^{৬৮} মূলত একেই বলে নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব।

৫. পারস্পরিক সহযোগিতা :

মুসলমানরা পরস্পরের মান-ইজ্জতের নিরাপত্তা বিধান, দুঃখ-কষ্টে অংশগ্রহণ, গঠনমূলক সমালোচনা, উপদেশ-নসীহত, একত্রে বসবাস করা সহ সার্বিক বিষয়ে পরস্পরের সহযোগী হবে এটাই স্বাভাবিক। আর এ ধরনের পরিবেশ তৈরিতে ভ্রাতৃত্বের কোন বিকল্প নেই। রাসূল (ﷺ) বলেন, **وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ** 'আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত কোন বান্দার সাহায্য করেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে নিমগ্ন থাকে'।^{৬৯}

এছাড়াও দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী স্বার্থপরতার মূলোৎপাটন, সর্বদা ভোগের বিপরীতে ত্যাগের মনোভাব তৈরি করার মধ্য দিয়ে পরকালীন জীবনে আল্লাহর সম্ভ্রুতি লাভের পথ সুগম করাই ইসলামী ভ্রাতৃত্বের মূল উদ্দেশ্য।

উল্লিখিত উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে ইসলামী আন্দোলনের কর্মী তথা মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির বিষয়ে মহান আল্লাহ এবং প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ) মুসলিম সমাজকে উদ্বুদ্ধ করে গেছেন। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ তার যৎসামান্য উপস্থাপন করা হল।

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ فِي تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادُّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى।

নোমান ইবনে বাশীর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'তুমি ঈমানদারদেরকে তাদের পারস্পরিক সহানুভূতি, বন্ধুত্ব ও দয়া-অনুগ্রহের

৬৮. তাহক্বীক্ব আব্দাউদ, হাদীছ নং ৩৫২৭; মিশকাত, হাদীছ নং ৫০১২, ছহীহ লি-গায়রিহি।

৬৯. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ২০৪, 'ইলম' অধ্যায়।

ক্ষেত্রে একটি দেহের মত দেখবে। যখন দেহের কোন অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন সমস্ত শরীর তজ্জন্য বিনিদ্র ও জ্বরে আক্রান্ত হয়।^{৭০}

عَنِ الثُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ إِنْ اشْتَكَى عَيْنُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ وَإِنْ اشْتَكَى رَأْسُهُ اشْتَكَى كُلُّهُ.

নোমান ইবনে বাশীর (রাযিরাহুতাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘সকল মুমিন এক ব্যক্তির মত, যদি তার চক্ষু অসুস্থ হয় তখন তার সর্বাঙ্গ অসুস্থ হয়ে পড়ে। আর যদি তার মাথায় ব্যথা হয় তখন তার সমস্ত দেহই ব্যথিত হয়।’^{৭১}

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا ثُمَّ شَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ.

আবু মুসা আশআরী (রাযিরাহুতাহ) হতে বর্ণিত, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘একজন মুমিন আর একজন মুমিনের জন্য এক গৃহের মত, যার একাংশ অপরাংশকে সুদৃঢ় রাখে। অতঃপর তিনি এক হাতের অঙ্গুলীগুলো অপর হাতের অঙ্গুলীর মধ্যে প্রবিষ্ট করালেন।’^{৭২}

উল্লিখিত তিনটি হাদীছে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক ও সুদৃঢ় অবস্থানের স্পষ্ট বর্ণনা উঠে এসেছে। দেহের প্রতিটি অঙ্গের স্বতন্ত্র অবস্থান ও কর্মপরিধি থাকলেও বিপদে যেমন পরস্পরের প্রতি সহমর্মী; তেমনি বর্ণে, বংশে, কর্মক্ষেত্রে বা ভৌগলিক অবস্থানগত পার্থক্য থাকলেও সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে বিশ্বের সকল মুসলমান একটি অখণ্ড শরীরের মত। পারস্পরিক সহযোগিতার কথা বলতে গিয়ে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْصُرُهُ مَظْلُومًا، فَكَيْفَ أَنْصُرُهُ ظَالِمًا؟ قَالَ: تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ، فَذَلِكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ.

হযরত আনাস (রাযিরাহুতাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘তুমি তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই সে অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত হোক। তখন

৭০. বুখারী-মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৩, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘সৃষ্টির প্রতি দয়া’ অনুচ্ছেদ।

৭১. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৪।

৭২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৫।

এক ব্যক্তি বলল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! অত্যাচারিতকে তো সাহায্য করব; কিন্তু অত্যাচারীকে কিভাবে সাহায্য করব? তখন নবী (ﷺ) বললেন, তাকে অত্যাচার করা থেকে বিরত রাখবে; এটিই তার সাহায্য করার নামাস্তর'।^{৭৩} পারম্পরিক সহযোগিতার পুরস্কার উল্লেখ করতে গিয়ে রাসূল (ﷺ) বলেন,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَسْلُمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'মুসলমান মুসলমানের ভাই, সে তার উপর যুলুম করবে না এবং তাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিবে না। যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের অভাবে সাহায্য করবে, আল্লাহ তা'আলা তার অভাবে সাহায্য করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার বিপদসমূহের কোন একটি বড় বিপদ দূর করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি ঢেকে রাখবেন'।^{৭৪} অন্য হাদীছে নবী (ﷺ) বলেন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ، التَّقْوَى هَهُنَا وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ : دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرْضُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'এক মুসলমান অপর মুসলমানের ভাই। কাজেই তার উপর যুলুম করবে না, তাকে লজ্জিত করবে না এবং তাকে হীন মনে করবে না। 'আল্লাহ্‌ভীতি এখানে' একথা বলে তিনি তিনবার নিজের বক্ষের দিকে ইংগিত করলেন। তিনি আরো বলেন, কোন ব্যক্তির মন্দ কাজ করার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে নিজের কোন মুসলমান ভাইকে হেয়জ্ঞান করে। বস্তুত একজন মুসলমানের সব

কিছুই অপর মুসলমানের জন্য হারাম। তার জ্ঞান, মাল ও ইজ্জত-আবরু’।^{৭৫} তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধের বিষয়টি সামনে রেখে ইহ ও পরকালীন মুক্তির লক্ষ্যে অপর মুসলমানের প্রতি পারস্পরিক সহযোগিতার হাত প্রসারিত করতে হবে।

৬. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা :

ইসলামী ভ্রাতৃত্বের আর একটি উদ্দেশ্য হল পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করা। মানুষ তার দ্বীনী ভাইয়ের কল্যাণ কামনায় সর্বদা উদগ্রীব থাকবে। তারই মঙ্গল সাধনে সর্বোত্তমভাবে চেষ্টা অব্যাহত রাখবে। তার কোন ক্ষতি হোক এমন কোন বিষয় তার দ্বারা সংঘটিত হবে না। অথচ সমাজে দেখা যায়, এক শ্রেণীর মানুষ তার দ্বীনী ভাইয়ের কল্যাণ কামনার পরিবর্তে ক্ষতি করার জন্য সর্বদা সময়, শ্রম, মেধা ও বুদ্ধি অপচয় করে থাকে। প্রতিনিয়ত নানা কূটকৌশল ও চক্রান্তের জাল বিস্তার করে বেড়ায়। একটি কৌশল ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলে নতুন ফন্দি আটে। বাহ্যত তারা মানুষের কাছে ভাল হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক। এ জাতীয় লোককে আল্লাহ পসন্দ করেন না; বরং তিনি প্রকৃতি ‘মুহসিন’ বান্দাকে পসন্দ করেন। মহান আল্লাহ বলেন, **أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**। ‘তোমরা মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুগ্রহকারীদের ভালবাসেন।’^{৭৬}

পারস্পরিক কল্যাণ কামনার বিষয়ে নবী করীম (ﷺ) বলেন, **الدِّينُ النَّصِيحَةُ** ‘দ্বীন হচ্ছে কল্যাণ কামনা’।^{৭৭} বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে তিনি কথ্যটি তিনবার উল্লেখ করেন। অন্যত্র তিনি বলেন,

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالنَّصِيحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ।

জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, ‘আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-এর হাতে ছালাত আদায়, যাকাত প্রদান এবং প্রত্যেক মুসলমানের কল্যাণ কামনা করার অঙ্গীকার করে বায়‘আত করলাম’।^{৭৮}

৭৫. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৯।

৭৬. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত ১৯৫।

৭৭. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৬৬।

মানুষের প্রতি মানুষের অধিকারের কথা বলতে গিয়ে আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, **حَقُّ الْمُؤْمِنِ** (করিম আল্) হতে বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'একজন মুমিনের উপরে আরেক মুমিনের ছয়টি কর্তব্য রয়েছে'। তন্মধ্যে একটি হল **وَإِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ** 'যখন সে তোমার কাছে পরামর্শ চাইবে, তখন তুমি তাকে (কল্যাণকর) উপদেশ দিবে'।^{৭৮}

অন্য একটি প্রসিদ্ধ হাদীছে বলা হয়েছে, এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের ছয়টি হক রয়েছে। তন্মধ্যে অন্যতম হল, **وَيُنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ** 'এবং উপস্থিত বা অনুপস্থিত উভয় অবস্থায় তার কল্যাণ কামনা করবে'।^{৭৯}

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ইসলামী ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে উপরোক্ত বিষয় ছাড়াও আরো অনেক বিষয় আছে যার মাধ্যমে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পাবে, সম্পর্ক অটুট থাকবে, সাথে সাথে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

৭৮. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৬৭।

৭৯. মুসলিম, হাদীছ নং ২১৬২; ইবনু হিব্বান, হাদীছ নং ২৪২।

৮০. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৭৩৭; নাসাঈ, 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সালাম' অনুচ্ছেদ, হাদীছ নং ৪৪২৫; মিশকাত, হাদীছ নং ৪৬৩০, হাদীছ ছহীহ।

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায়

শরী'আতে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির বিভিন্ন নিয়ামকের বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে সেসব কর্ম ও আচরণ গ্রহণ ও অনুসরণ করলে পারস্পরিক সম্পর্ক সুদৃঢ় ও স্থায়ী হয়, বন্ধুত্ব ও হৃদয়তা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং এর ফলে দু'টি হৃদয় সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঘনিষ্ঠতর ও ময়বুত হয়। এক্ষেত্রে শরী'আতের কিছু আহকাম আছে আবশ্যকীয় এবং কিছু আছে ইচ্ছাধীন। তবে পারস্পরিক ভালবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্ক বিকশিত ও ফুলে-ফলে সুশোভিত করার জন্য উভয়েরই গুরুত্ব অনস্বীকার্য। নিম্নে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির কতিপয় নিয়ামক সম্পর্কে যৎসামান্য আলোকপাত করা হল।

১. সালাম প্রদান :

মুমিন জীবনে সালামের গুরুত্ব অপরিসীম। আদম(عليه السلام)-কে সৃষ্টি করে তাঁর উপর আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রথম যে নির্দেশ প্রদান করা হয়, তা হল ফেরেশতাদের উদ্দেশ্যে সালাম প্রদান।^{৮১} সালামের বহুমুখী দিক রয়েছে। যেমন সালামের ফযীলত, সালাম প্রদানকারী অহঙ্কার হতে মুক্ত, সালাম প্রদান করা হক্ক, সালাম না দেওয়া কৃপণতা ইত্যাদি। এছাড়াও আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, সালাম প্রদানের মাধ্যমে পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। কারণ সালামের অর্থই হল দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি শান্তি, রহমত ও বরকত প্রার্থনা করা। সালামের মাধ্যমে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، أَوْ لَا أَذْلكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ.

সেই প্রেরণা থেকেই আপসে করমর্দন করে থাকে। এর মাধ্যমে যেমন বন্ধুত্ব সুসংহত হয়, তেমনি উভয়ের গোনাহ মাফ হয়।

عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَلْتَقِيَانِ فَيَتَصَافَحَانِ إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقَا.

বারা ইবনে আযিব (রাযিরাজা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, ‘যখন দু’জন মুসলমানের পরস্পর সাক্ষাৎ হয় এবং তারা মুছাফাহা করে, পৃথক হওয়ার পূর্বেই তাদের উভয়ের গোনাহ মাফ করে দেওয়া যায়’।^{৮৪}

তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কৃত গোনাহ হতে পরিত্রাণ লাভের সহজ ও সুন্দর মাধ্যম হিসেবে মুমিন জীবনে বেশি বেশি সালাম ও মুছাফাহার প্রচলন করা উচিত।

৩. হাদিয়া প্রদান :

ভালবাসা ও আন্তরিকতা প্রকাশের উদ্দেশ্যে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্য আপন জনের মধ্যে যে উপহার ও উপঢৌকন প্রদান করা হয় তাকে ‘হাদিয়া’ বলা হয়। হাদিয়া প্রদান ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটি অন্যতম নিয়ামক। প্রকৃতপক্ষে ভাল কথা বলা, উৎকৃষ্ট আচরণ করা, সৎ পরামর্শ প্রদান ইত্যাদিও এক ধরনের হাদিয়া। এর মাধ্যমে একজন মানুষ অতি সহজেই অন্যের হৃদয়কে আকৃষ্ট করে তার সাথে যোগসূত্র রচনা করতে পারে। তেমনি বস্তুগত হাদিয়ার মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক প্রেম-প্রীতি ও বন্ধুত্ব বৃদ্ধি পায়।

হাদিয়া প্রদানকে উৎসাহ দিয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যেমন উপদেশ দিয়েছেন, তেমনি হাদিয়া প্রদানের উপকারিতাও বর্ণনা করেছেন। যেমন তিনি বলেন, تَهَادَوْا تَحَابُّوا ‘তোমরা একে অপরকে হাদিয়া পাঠাও, এর দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে’।^{৮৫} আনাস (রাযিরাজা) বলতেন, يَا بَنِيَّ! تَبَادَلُوا بَيْنَكُمْ, ‘হে বৎসগণ! তোমরা একে অপরের জন্য অর্থ-সম্পদ ব্যয় করবে, এতে তোমাদের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হবে’।^{৮৬} রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিজে যেমন তাঁর সঙ্গী-সাথীদের হাদিয়া দিতেন, তেমনি ছাহাবীগণও

৮৪. আহমাদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত, ‘মুছাফাহা’ অধ্যায়, হাদীছ নং ৪৬৭৯, হাদীছ ছহীহ।

৮৫. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৫৯৪; ইরওয়াউল গালীল হাদীছ নং ১৬০১, হাসান।

৮৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৫৯৫, সনদ ছহীহ, ‘হাদিয়া গ্রহণ করা’ অনুচ্ছেদ।

তাকে ও অন্য ছাহাবীদেরকে হাদিয়া প্রদান করতেন। হাদিয়ার মাধ্যমে বন্ধুত্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি বৈরিতাও দূর হয়।

কেউ হাদিয়া দিলে তার প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এতে পারস্পরিক সম্পর্ক আরো মধুর হয়। হাদিয়ার প্রতিদান সমপরিমাণের জিনিষ হতে হবে এমন কোন কথা নেই। বরং নিজ সাধ্যানুযায়ী প্রতিদান দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। অনুরূপ হাদিয়া প্রদানের পর তা ফিরিয়ে নেওয়াও শোভনীয় নয়।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السُّوءِ، الْعَائِدُ فِي هَيْبَتِهِ، كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِي فَيْئِهِ.

ইবনে আববাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘আমাদের জন্য মন্দ দৃষ্টান্ত শোভনীয় নয়। যে দান করে তা প্রত্যাহার করে নেয়, তার দৃষ্টান্ত এমন কুকুরের মত যে বমি করে পুনরায় তা গলাধঃকরণ করে নেয়’।^{৮৭} তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে বেশি বেশি হাদিয়ার প্রচলন করা উচিত।

৪. হাসিমুখে কথা বলা :

মুমিনের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে হাসিমুখে কথা বলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। হাসিমুখে কথা বলার মাধ্যমে অতি সহজেই অন্যের মন জয় করা সম্ভব। তাছাড়া কর্কষভাষী বা কঠিন হৃদয়ের মানুষকে কেউ পসন্দ করে না। মহান আল্লাহ বলেন, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. হৃদয় হয়েছিলে। যদি তুমি রূঢ় ও কঠিন হৃদয়ের লোক হতে, তবে তোমার নিকট থেকে তারা দূরে সরে যেত’।^{৮৮} অনুরূপভাবে মিষ্টি হেসে কথা বলাকে রাসূলুল্লাহ (সঃ) ছাদাক্বা হিসেবে উল্লেখ করেছেন।^{৮৯} তাছাড়া ভাল ও সুন্দর কথা পরকালে জাহান্নামের শাস্তি থেকে আত্মরক্ষায় সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করবে। যেমন-

৮৭. আল-আদাবুল মুফরাদ, বাংলা, অনুচ্ছেদ-১৯৬, হাদীছ নং ৪১৯।

৮৮. সূরা আল ইমরান, আয়াত ১৫৯।

৮৯. তিরমিযী, মিশকাত, হাদীছ নং ১৯১১, ‘ছাদাক্বার ফযীলত’ অনুচ্ছেদ।

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِثْقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ ثَمَرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ خَبْلَكُمْ طَيِّبَةً.

আদি বিন হাতেম (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন, ‘জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা কর। যদিও তা অর্ধেক খেজুরের বিনিময়েও হয়। যে তাও দান করতে অক্ষম, সে লোকজনকে ভাল ও সুন্দর কথা দ্বারা জাহান্নামের আগুন থেকে আত্মরক্ষা করবে’।^{১০} অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَالْكَلِمَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْكَلِمَةُ, الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ. আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) এরশাদ করেন, ‘ভাল কথাও ছাদাক্বা হিসেবে গণ্য হবে’।^{১১} তিনি আরো বলেন,

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا تَخْفِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا وَلَوْ أَنَّ تَلَقَّى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلِيقٍ.

আবু যর (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) আমাকে বলেছেন, ‘ভাল কাজের কোনটাকেই তুচ্ছ মনে করবে না। যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাতও হয়’।^{১২}

উল্লিখিত কুরআন ও হাদীছের আলোচনা থেকে একথা নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে, পরকালে পাপ মুক্তির অসিলা হিসেবে হাসিমুখে কথা বলার গুরুত্ব অপরিসীম। সাথে সাথে দুনিয়াবী জীবনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতেও হাসিমুখ ও কোমল আচরণের বিকল্প নেই।

৫. পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করা :

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হল পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাৎ। একজন মুসলমান প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে অপর দ্বীনী ভাইয়ের সাথে দেখা-সাক্ষাৎ করবে, এটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন পারস্পরিক হৃদয়তা বৃদ্ধি পায়, তেমনি আব্বাছহও সম্ভব হন। যার মাধ্যমে উভয়েরই পরকালে জান্নাত লাভের পথ সুগম হয়। এমর্মে নিম্নোক্ত হাদীছগুলো প্রণিধানযোগ্য।
যেমন-

১০. বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ৬৯৪।

১১. বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ৬৯৫; মিশকাত, হাদীছ নং ১৮৯৬।

১২. মুসলিম, বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ৬৯৬; মিশকাত, হাদীছ নং ১৮৯৪।

আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে পরস্পরে দেখা-সাক্ষাৎ করার গুরুত্ব বর্ণিত হয়েছে নিম্নের হাদীছেও। আবু ইদরীস খাওলানী (রাঃ) হতে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে বলা হয়েছে-

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَحَبَّتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ وَالْمُتَحَالِسِينَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ.

মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে পরস্পর মুহাব্বত করে, আমার সন্তোষের উদ্দেশ্যে পরস্পর উঠা-বসা করে, আমার সন্তোষের আশায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাৎ করে এবং আমার উদ্দেশ্যেই পরস্পর নিজেদের সম্পদ খরচ করে, তাদের মুহাব্বত করা আমার জন্য ওয়াজিব হয়ে যায়'।^{৯৪}

পারস্পরিক দেখা-সাক্ষাতে মুমিনের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির মাধ্যমে যেমন দুনিয়াবি সম্পর্ক সুদৃঢ় হয়, অনুরূপ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মধ্যদিয়ে প্রত্যেক মুমিনের কান্ধিত ঠিকানা জান্নাত লাভের পাথও সুগম হয়।

৬. বিপদে-আপদে সাহায্য করা :

কোন মানুষের পক্ষে পৃথিবীতে একাকী বসবাস করা সম্ভব নয়। বিভিন্ন প্রয়োজনে একে অপরের সাহায্য ছাড়া মানুষ চলতে পারে না। এছাড়াও নানা বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতিতে অন্যের সাহায্যের প্রয়োজন পড়ে। কেননা কোন

৯৩. মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৬৭; মিশকাত, হাদীছ নং ৫০০৭।

৯৪. মুওয়াত্তা মালেক, মিশকাত, হাদীছ নং ৫০১১; রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ ৩৮৩, হাদীছ ছহীহ।

মানুষ যখন কোন বিপদের সম্মুখীন হয়, তখন সে সবচেয়ে বেশি অসহায়ত্ব অনুভব করে। ঐ সময় সে আন্তরিকভাবে অন্যের সাহায্য প্রত্যাশা করে।

এক্ষেত্রে ইসলামী শরী‘আতের বিকল্প নেই। ইসলামী শরী‘আতে মুমিনের পারস্পরিক সম্পর্ক হল একটি দেহের ন্যায়। দেহের একটি অঙ্গ যে কোন ধরনের বিপদে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অঙ্গ তাকে সাহায্যের জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠে। উদাহরণ স্বরূপ- কারো চোখে কোন কিছু পড়ার সাথে সাথে দেহের অন্যান্য সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের আপন আপন কাজ বন্ধ হয়ে যায় এবং তারা সকলে কিভাবে চোখকে তার বিপদ থেকে রক্ষা করবে সেদিকে নিমগ্ন হয়ে পড়ে। প্রয়োজনে অন্যেরও শরণাপন্ন হয়। অনুরূপ কোন মুসলমান ভাই যখন কোন প্রকার বিপদে পড়ে, তখন অপর মুসলমান ভাইয়ের কর্তব্য তাকে সাহায্য করা। কেননা যে মানুষকে সাহায্য করে আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسِّرْهُ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) বলেন, ‘যে ব্যক্তি কোন মুমিনের পার্থিব দুঃখ-কষ্ট দূর করবে, আল্লাহ কিয়ামতে তার দুঃখ-কষ্ট দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোন সংকটাপন্ন ব্যক্তির সংকট নিরসন করবে, আল্লাহ তার দুনিয়া ও আখিরাতের যাবতীয় সংকট নিরসন করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আর আল্লাহ ততক্ষণ পর্যন্ত বান্দার সাহায্য করে থাকেন, যতক্ষণ পর্যন্ত বান্দা নিজ ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে।’^{৯৫}

অপর এক হাদীছে রাসূল (সঃ) বলেন, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ছাদাক্বা করা ওয়াজিব। একজন প্রশ্ন করলেন, যদি কারো সে সামর্থ্য না থাকে, তবে কি হবে? ... ছাহাবাদের পর্যায়ক্রমিক প্রশ্নের উত্তরে এক পর্যায় তিনি বলেন, ‘فَيَعِينُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوفُ’ ‘তাহলে কোন দুঃখে বা বিপদে পতিত ব্যক্তিকে সাহায্য করবে’।^{৯৬}

৯৫. মুসলিম, তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৩০; আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৯৪৬, হাদীছ হুহীহ।

৯৬. বুখারী ও মুসলিম, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ২২৫; মিশকাত হাদীছ নং ১৮৯৫।

কোন মানুষের কঠিন বিপদের মুহূর্তে যখন কেউ তাকে সাহায্য করে, তখন তার এ সাহায্যের কথা সে কখনো ভোলে না বা ভুলতে পারে না। যারা বিপদগ্রস্ত মানুষের সাহায্যকারী হয়, তারাই প্রকৃত বন্ধু। এজন্য ইংরেজীতে প্রবাদ আছে, A friend in need is a friend indeed. 'বিপদের বন্ধুই প্রকৃত বন্ধু'। তাই ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে এটি একটা বড় উপাদান।

৭. রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া :

মানব জীবনে বিপদ-আপদের যতগুলো ক্ষেত্র আছে, তার মধ্যে অসুস্থতা অন্যতম। দুনিয়াবী জীবনে মানুষ যে কত বড় অসহায়, তার বাস্তব উপলব্ধি ঘটে অসুস্থ অবস্থায়। এমত পরিস্থিতিতে কোন শত্রুও যদি তাকে দেখতে আসে বা তার সাহায্যে এগিয়ে আসে, তবে সে তাকে আর শত্রু মনে করে না। সে তখন তার নিকটে পরম বন্ধুতে পরিণত হয় এবং তার অন্তরে ঐ ব্যক্তির জন্য আলাদা একটা স্থানও তৈরি হয়ে যায়। তাই রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া বা সাধ্যমত তার দেখ-ভাল করা ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটা বড় উপায়।

রুগ্ন ব্যক্তির দেখা-শোনার বিষয়টি ইসলামী শরী'আতও অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **عُودُوا الْمَرِيضَ، وَابْتَغُوا الْجَنَائِزَ، تُذَكَّرُ**, 'রুগ্ন ব্যক্তিকে দেখতে যাবে এবং জানাযার অনুসরণ করবে (কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করবে), তাহলে তা তোমাকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে'।^{৯৭} একজন মুসলমানের প্রতি অপর মুসলমানের হক বা কর্তব্য সম্পর্কে যে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, সেগুলোর প্রত্যেকটিতে **عِيَادَةُ الْمَرِيضِ** তথা 'রোগীর পরিচর্যা'র বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত আছে। এছাড়াও ক্বিয়ামতের ময়দানে রুগ্ন ব্যক্তির পক্ষে মহান আল্লাহ নিজেই ফরিয়াদী হয়ে আদম সন্তানকে জিজ্ঞেস করবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি রুগ্ন ছিলাম তুমি পরিচর্যা করনি' ...।^{৯৮} রুগ্ন ব্যক্তির সেবার মাধ্যমেই প্রভুর নৈকট্য লাভ করা সহজ।

রোগী পরিচর্যার ফযীলত সম্পর্কে অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।^{৯৯} রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, **مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاصًّا فِي الرَّحْمَةِ، حَتَّى إِذَا قَعَدَ**, 'যদি কোন ব্যক্তি কোন রুগ্নীর পরিচর্যা করে, সে রহমতের মধ্যে

৯৭. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৫১৮; সিলসিলা হুহীহাহ, হাদীছ নং ১৯৮১, হা. হুহীহ।

৯৮. মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৬৯; মিশকাত, হাদীছ নং ১৫২৮।

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعُودُ بَعْضَ أَهْلِهِ يَمْسَحُ بِيَدِهِ
الْيُمْنَى وَيَقُولُ : أَذْهَبَ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا
شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُعَادِرُ سَقَمًا.

আয়েশা(মুহিবরাহা-৮)
আনব) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম(ﷺ) স্বীয় পরিবারের কোন রোগীকে দেখতে গেলে তার গায়ে হাত রেখে বলতেন, 'আযহিবিল বাস রক্কান নাস ওয়াশফী আনতাশ শাফী লা শিকাআ ইল্লা শিকাউকা শিকাআল লা যুগাদিরু সাঙ্কামা' 'হে আল্লাহ! হে মানুষের প্রভু! রোগ দূর কর, রোগ-মুক্তি দান কর। তুমিই রোগ-মুক্তি দানকারী। তোমার রোগ-মুক্তি ছাড়া কোন রোগ-মুক্তি নেই। এমন রোগ-মুক্তি কোন রোগ বাকী রাখবে না'।^{১০৪}

ইসলামী শরীআতে রোগী দেখার বিধান শুধু মুসলমানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল রুগ্ন-ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ হুকুম সমভাবে প্রযোজ্য। নিম্নের হাদীছ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ غُلَامٌ يَهُودِيٌّ يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُوذُهُ فَقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَقَالَ لَهُ أَسْلِمَ فَنَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَهُوَ عِنْدُهُ فَقَالَ أَطْعَمَ أَبَا الْقَاسِمِ فَأَسْلَمَ فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একটি ইহুদী ছেলে নবী করীম (সঃ)-এর সেবা করত। একদিন সে অসুস্থ হয়ে পড়ল। তখন নবী (সঃ) তাকে দেখতে গেলেন। তিনি তার মাথার কাছে বসলেন। তারপর তাকে বললেন, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর। সে তার পিতার দিকে তাকাল। তার পিতা তার কাছেই ছিল। তখন তার পিতা বলল, তুমি আবুল কাসেমের আনুগত্য কর। তখন ছেলেটি ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর নবী (সঃ) এই কথা বলতে বলতে সেখান থেকে বের হলেন, ‘সমস্ত প্রশংসা সেই সত্তার, যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন’।^{১০৫} এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত হাদীছটিও স্মরণযোগ্য।

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ أَبَا طَالِبٍ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلٍ فَقَالَ أَيُّ عَمٍّ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَلِمَةُ أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عِنْدَ اللَّهِ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أُمَيَّةٍ يَا أَبَا طَالِبٍ تَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَمْ يَزَالَا يُكَلِّمَانِهِ حَتَّى قَالَ آخِرَ شَيْءٍ كَلِمَتُهُمْ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أَنَّهُ عَنْهُ فَتَزَلَّتْ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَوْلِيَا قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْحَجِيمِ وَتَزَلَّتْ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ.

ইবনু মুসাইয়্যাব তার পিতা হতে বর্ণনা করেন, যখন আবু তালিবের মূমূর্ষু অবস্থা, তখন রাসূল (সঃ) তার নিকট গেলেন। আবু জাহল ও তার নিকট উপবিষ্ট ছিল। নবী (সঃ) তাকে লক্ষ্য করে বললেন, চাচাজান, ‘লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ’ কালেমাটি একবার পড়ুন, তাহলে আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট কথা বলতে পারব। তখন আবু জাহল ও আব্দুল্লাহ ইবনু উমাইয়া বলল, হে আবু তালিব! তুমি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম হতে ফিরে যাবে? এরা দু’জন তার সাথে এ কথাটি বারবার বলতে থাকল। সর্বশেষ আবু তালিব তাদের সাথে যে কথাটি বলল, তাহল, আমি আব্দুল মুত্তালিবের মিল্লাতের উপরেই আছি। এ কথার পর নবী (সঃ) বললেন, আমি আপনার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকব যে পর্যন্ত আপনার ব্যাপারে আমাকে নিষেধ করা না হয়। এ প্রসঙ্গে এ আয়াতটি নাযিল হল : ‘নবী ও মুমিনদের পক্ষে উচিত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদি তারা নিকটাত্মীয়ও হয়

যখন তাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা জাহান্নামী' (তওবা ১১৩)। আরো নাইল হল : 'আপনি যাকে ভালবাসেন ইচ্ছা করলেই তাকে হিদায়াত করতে পারবেন না' (কাসাস ৫৬)।^{১০৬} বর্ণিত হাদীছ দু'টি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রুগ্ন ব্যক্তি যেই হোক না কেন, তাকে দেখতে যাওয়া মুসলমানের নৈতিক দায়িত্ব। আর এ কাজের মাধ্যমে অবশ্যই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

৮. আগোষ-মীমাংসা করা :

সমাজ ও সংগঠনবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে গেলে ব্যক্তি বা সংগঠনের মধ্যে কখনো কখনো পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি, মন কষাকষি বা ঝগড়া-ঝাটি হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। যদিও এ রকম পরিস্থিতি সৃষ্টির ক্ষেত্রে শয়তান মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। এমতাবস্থায় তৃতীয় একটি পক্ষকে এগিয়ে এসে তাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদ মিটিয়ে দিতে হবে। এটা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ বলেন, **إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ** 'নিশ্চয়ই মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই। সুতরাং তোমাদের ভাইদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হবে'।^{১০৭} এর আগের আয়াতে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সীমা অতিক্রমকারীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করারও নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন,

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

'মুমিনদের দুই দল দ্বন্দ্ব লিপ্ত হলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিবে; আর তাদের একদল অপর দলের বিরুদ্ধে বাড়াবাড়ি করলে যারা বাড়াবাড়ি করে তাদের বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। যদি তারা ফিরে আসে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গতভাবে ফায়ছালা করে দিবে এবং সুবিচার করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন'।^{১০৮}

১০৬. বুখারী, হাদীছ নং ৩৮৮৪।

১০৭. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১০।

১০৮. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ৯।

৯. দো'আ ও কল্যাণ কামনা করা :

মানব জীবনের সকল কল্যাণ-অকল্যাণের মূল চাবিকাঠি সর্বশক্তিমান আল্লাহর হাতে। তাই যে কোন সমস্যার সমাধান বা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের ক্ষেত্রে সাধ্যমত নিজ প্রচেষ্টার পাশাপাশি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করতে হবে। সেক্ষেত্রে নিজের জন্য চাওয়ার পাশাপাশি দ্বীনী ভাইয়ের জন্যও প্রার্থনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ফলে মুমিন ভাইয়ের প্রতি একটা পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। সাথে সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে রাসূল (ﷺ) বলেন, **دَعْوَةُ الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ مُسْتَجَابَةٌ، عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ مُوَكَّلٌ. كُلَّمَا دَعَا لِأَخِيهِ بِخَيْرٍ، قَالَ الْمَلَكُ الْمُوَكَّلُ بِهِ آمِينَ.** 'কোন মুসলিম ব্যক্তি যখন তার ভাইয়ের অলক্ষ্যে তার জন্য দো'আ (করে এবং আল্লাহর দরবারে) গৃহীত হয়। তখন তার মাথার নিকটে একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা থাকে। যখন সে তার মুসলমান ভাইয়ের জন্য কল্যাণ কামনা করে, তখন দায়িত্বপ্রাপ্ত ফেরেশতা বলেন, আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক।' ^{১১৩} তিনি আরো বলেন, **إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ الْعَيْبِ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ آمِينَ، وَلَكَ بِمَثَلٍ.** 'যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য অলক্ষ্যে দো'আ করে, তখন ফেরেশতারা বলেন, আমীন! তোমার জন্যও অনুরূপ হৌক।' ^{১১৪}

কোন ব্যক্তি যখন জানতে পারে যে, আমার অমুক দ্বীনী ভাই প্রভুর নিকটে আমার কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করছে, তখন নিজের অজান্তেই তার হৃদয়ের মণিকোঠায় ঐ দ্বীনী ভাইয়ের জন্য একটা স্থায়ী আসন তৈরি হয়ে যায়। অর্থাৎ সে ঐ ভাইয়ের এহেন আচরণে যারপরনাই মুগ্ধ হয়। এমতাবস্থায় পরস্পরের অন্তরের সকল মলিনতা, বিদ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি বিদূরিত হয়, যা তাদের পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধনকে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় করতে সাহায্য করে।

মুসলমানের পারস্পরিক দো'আ ও কল্যাণ কামনার অন্যতম মাধ্যম হল 'সালাম'। তাছাড়াও ছালাতের ভিতরে ও বাইরে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন দো'আয় নিজের কল্যাণ প্রার্থনার পাশাপাশি মুমিন ভাইয়ের জন্যও

১১৩. মুসলিম, হাদীছ নং ২৭৩৩, 'যিকর, দো'আ ও তওবা' অধ্যায়, 'মুসলমানদের জন্য অলক্ষ্যে দো'আ করার ফযীলত' অনুচ্ছেদ।

১১৪. আবুদাউদ, হাদীছ নং ১৫৩৪, হাদীছ ছহীহ, 'ছালাত' অধ্যায়, 'অলক্ষ্যে দো'আ' অনুচ্ছেদ।

দো‘আ ও ক্ষমা প্রার্থনার বিধান রয়েছে। যেমন জানাযার ছালাতের দো‘আ। তাই পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রত্যেক মুমিনের উচিত অপর মুমিনের কল্যাণ কামনা করা।

১০. যথোপযুক্ত সম্মান করা :

প্রত্যেক মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান করতে হবে, এটাই শারঈ হুকুম। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفِضِ الْإِيمَانَ إِلَى قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ تَتَّبَعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ، وَمَنْ تَتَّبَعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يُفْضَحْهُ وَلَوْ فِي حَوْفِ رَحْلِهِ.

‘হে ঐ সকল লোক! যারা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছে, কিন্তু ঈমান তাদের অন্তরে প্রোথিত হয়নি, তোমরা মুসলমানদেরকে কষ্ট দিয়ো না, তাদেরকে ভৎসনা কর না এবং তাদের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান কর না। কেননা যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করে বেড়ায়, আল্লাহ তার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন। আর আল্লাহ যার দোষ-ত্রুটি অনুসন্ধান করবেন, তাকে অপদস্থ করবেন, সে তার বাড়ীতে অবস্থান করলেও’।^{১১৫} তবে অতিরঞ্জিতভাবে কারো সম্মান করা বা প্রশংসা করা ইসলামী শরী‘আতে নিষেধ। এমনকি কারো সামনা-সামনি প্রশংসা করাও নিষেধ।^{১১৬} কেননা এর মাধ্যমে মানুষের অন্তরে অহংকার পয়দা হয়, যা তার জন্য মারাত্মক ক্ষতির কারণ। কেননা لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ كِبَرٍ। ‘কোন ব্যক্তির অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না’।^{১১৭} অর্থাৎ অহংকারের শেষ পরিণতি জাহান্নাম। এ মর্মে রাসূল (ﷺ) এর বাণী স্পষ্ট।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةٍ : قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

১১৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ২০৩২, ‘মুমিনকে সম্মান করা’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ হাসান।

১১৬. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩৯৩, ২৩৯৪, হাদীছ ছহীহ।

১১৭. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫১০৭।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইয়ার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাব। অপর বর্ণনায় আছে, তাকে আমি জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।^{১১৮}

অপরদিকে বয়সানুপাতে মানুষের প্রতি পারস্পরিক সম্মান ও ভালবাসা পোষণ করা উচিত। এ মর্মে রাসূল (সঃ) বহু হাদীছ বর্ণনা করেছেন। যেমন
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا وَيُجِلِّ كَبِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا.

আবু উমামা (রাঃ) বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছোটদের প্রতি দয়া করে না এবং বড়দের প্রতি সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।^{১১৯} রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেন, إِنْ مِنْ إِحْلَالِ اللَّهِ إِكْرَامَ ذِي الشَّيْبَةِ 'মুসলিম বয়োবৃদ্ধকে সম্মান করা আল্লাহকে সম্মান করার নামাস্তর ...'।^{১২০}

শুধু ছোট বা বড়দের ক্ষেত্রে নয়, ধনী-দরিদ্র, ব্যবসায়ী-চাকুরীজীবী, উঁচু-নীচু তথা সমাজের সর্বস্তরে পারস্পরিক মান-মর্যাদা প্রদান করা হলে একদিকে যেমন ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে সে সমাজে পূর্ণমাত্রায় শান্তি ও শৃঙ্খলা সুপ্রতিষ্ঠিত হবে এতে কোনই সন্দেহ নেই।

১১. সুপরামর্শ ও সদুপদেশ দেওয়া :

কোন ব্যক্তি যখন কারো কাছ থেকে কোন জরুরী প্রয়োজনে ভাল পরামর্শ বা সদুপদেশ পায়, তখন ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে তার অন্তরে সহানুভূতি সৃষ্টি হয়। যা ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে সকল ক্ষেত্রে একজন মানুষের সমান অভিজ্ঞতা থাকে না। সেক্ষেত্রে কোন কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যারা অভিজ্ঞ তাদের পরামর্শ জরুরী হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তাকে সুপরামর্শ ও সদুপদেশ দেওয়া উচিত। এ বিষয়ে নবী করীম (সঃ) বলেন,

১১৮. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫১১০, 'ক্রোধ ও অহংকার' অনুচ্ছেদ।

১১৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৩৫৬. হাদীছ হাসান ছহীহ।

১২০. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৪৩, হাদীছ হাসান, 'মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী সম্মান প্রদান করা' অনুচ্ছেদ; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৩৫৭।

إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا وَلَا خَلِيفَةً إِلَّا وَكَهُ بَطَائِنَانِ، بَطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، وَمَنْ يُوقِ بَطَانَةَ السُّوءِ فَقَدْ وَفَّى.

‘আল্লাহ কোন নবী বা খলীফাকে প্রেরণ করেননি, যার সাথে দু’টি অন্তরঙ্গ পরামর্শক দেননি। একটি তাকে ভাল কাজে প্রেরণা যোগায় এবং মন্দ কাজ হতে বারণ করে। আর অপরটি তার সর্বনাশ সাধন করে। যে ব্যক্তি মন্দের প্ররোচনাদানকারী হতে রক্ষা পেয়েছে, সে প্রকৃতই বেঁচে গেছে।’^{১২১}

ভুল পরামর্শ দাতার পরিণতি সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَقَوَّلَ عَلَى مَالٍ أَقْلَ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ اسْتَشَارَهُ أَخُوهُ الْمُسْلِمُ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِغَيْرِ رُشْدٍ فَقَدْ خَانَهُ، وَمَنْ أَفْتَى فُتْيًا بِغَيْرِ ثَبَتٍ فَإِثْمُهُ عَلَى مَنْ أَفْتَاهُ.

আবু হুরায়রা (রাযিআল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, ‘আমি বলিনি এমন কোন কথা আমার নামে যে বলবে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে খুঁজে নেয়। যার কাছে কোন মুসলমান ভাই পরামর্শ চায়, আর সে তাকে ভুল পরামর্শ দেয়, প্রকৃতপক্ষে সে খিয়ানত বা বিশ্বাস ভঙ্গ করল। আর যে ব্যক্তি বিনা প্রমাণে কোন ফাতওয়া দিল, এর যাবতীয় গোনাহ তার উপর বর্তাবে।’^{১২২}

এ আলোচনা থেকে নিশ্চিতভাবে বুঝা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের উচিত অন্যকে সৎ ও ভাল পরামর্শ প্রদান করা। আর কোন ব্যক্তি যখন কারো নিকট থেকে সুপরামর্শ পেয়ে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উপকৃত হয়, তখন সংগত কারণেই সে ঐ ব্যক্তির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ে, যা পারস্পরিক ভালবাসা বৃদ্ধির অন্যতম একটি লক্ষণ।

১২. দোষ-ত্রুটি শুধরে দেওয়া :

একজন মুমিন অপর মুমিনের ভাই।^{১২৩} সুতরাং ভাই ভাইয়ের সকল প্রকার ভুল-ভ্রান্তি, দোষ-ত্রুটি সংশোধন করে দিবে এটাই স্বাভাবিক। এর মাধ্যমে ভাইয়ের দুনিয়াবী চলার পথ সুগম হয়, পরকালীন হিসাব সহজ হয়, সাথে সাথে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়। এ বিষয়ে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর

১২১. তিরমিযী, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ২৫৬, হাদীছ ছহীহ।

১২২. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ২৬০।

১২৩. সূরা আল-হজুরাত, আয়াত ১০।

১৪. ব্যক্তিগত ব্যাপারে আত্মপ্রকাশ :

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটি অন্যতম দিক হল দ্বীনী ভাইয়ের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপারে খোঁজ নেওয়া তথা উৎসুক্য প্রকাশ করা। ভাইয়ের সঙ্গে যখন সাক্ষাৎ হবে, তখন কুশল বিনিময়ের পাশাপাশি তার পরিবারের অন্যদের অবস্থা জানতে চাওয়া উচিত। এর মাধ্যমে আন্তরিকতা ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পায়। তবে প্রথমে দ্বীনী ভাইয়ের সার্বিক অবস্থা যেমন- নাম, ঠিকানা, বংশ-পরিচয়, পরিবারের সদস্য সংখ্যা, আর্থিক অবস্থা, পিতা-মাতা ইত্যাদি সম্পর্কে জেনে নেওয়া প্রয়োজন। এর দ্বারা পারস্পরিক ভালবাসার শিকড় অধিকতর মজবুত হয়।

১৫. উৎকৃষ্ট নামে ডাকা :

মানুষমাত্রই নিজেকে অন্যের নিকটে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে চায়। এটা মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ এটাও চায় যে, অন্যে তাকে উপযুক্ত ও উৎকৃষ্ট ভাষায় সম্বোধন করুক। কাউকে যত প্রীতিপূর্ণ ভাষা ও আবেগময় ভঙ্গিতে সম্বোধন করা হবে, এর মাধ্যমে সম্বোধনকারীর আন্তরিকতা ও বন্ধুত্বের ভাব ততবেশি প্রকাশিত হবে। এতে করে যাকে ডাকা হবে, তার অন্তরও ঐ ব্যক্তির প্রতি আকৃষ্ট হবে এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

বাস্তবে দেখা যায়, কাউকে ডাকার সময় তার নামের প্রথম বা শেষাংশ উল্লেখ করে ডাকা হয়। এতে একদিকে যেমন শ্রুতিমধুর হয় না, অন্যদিকে অনেক ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির নামের অর্থও বিকৃত হয়ে যায়, যা পাপের কারণ হতে পারে। যেমন কারো নাম যদি হয় ‘আব্দুর রায্যাক’ যার অর্থ ‘রিযিকদাতার বান্দা’; কিন্তু তাকে যদি শুধু ‘রায্যাক’ বলে ডাকা হয়, তার অর্থ দাঁড়াবে ‘রিযিকদাতা’, যা বলা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, হয়তো কোন কারণে কারো হাত কাটা, পা খোঁড়া বা চোখে সমস্যা। তখন তাকে সম্বোধন করার সময় উক্ত বিকলঙ্গতার উল্লেখ করা হয়। যেমন কানা অমুক, লেংড়া অমুক ইত্যাদি। আবার অনেককে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়তো কখনো কোন অন্যায় কাজ করেছে, পরবর্তীতে তার নামের আগে বা পরে ঐ অপকর্মের বিষয়টি জুড়ে দিয়ে তাকে ডাকা হচ্ছে। যা ঐ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক। কাউকে লাজ্জিত করা, হেয় প্রতিপন্ন করা বা লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে এ রকম কোন খারাপ নামে ডাকা ইসলামী শরী‘আতে নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ

الْإِيمَانِ. 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমান আনার পরে কাউকে মন্দ নামে ডাকা পাপ'।^{১২৬} একদা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বনী সালিমাহ গোত্রে আসেন। তাদের প্রায় প্রত্যেকের দু'টো বা তিনটি নাম ছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ডাকা শুরু করলেন, হে অমুক! তখন তারা বলতে লাগল, থামুন হে আল্লাহর রাসূল! সে এই নাম শুনলে ক্রুদ্ধ হয়। তখন উক্ত আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।^{১২৭}

সমাজে এমন অনেক মানুষ আছে, যারা উপনামে সমধিক প্রসিদ্ধ। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি উক্ত নামে ডাকার ক্ষেত্রে কোন প্রকার মনে কষ্ট না পায় বা তার আপত্তি না থাকে, তাহলে তাকে উপনামে ডাকা দোষের নয়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-এর সময় এমনটি অনেকের ক্ষেত্রে ঘটেছে। যেমন প্রসিদ্ধ ছাহাবী 'আবু হুরায়রা'র প্রকৃত নাম আব্দুর রহমান। অনুরূপভাবে লম্বা হাতওয়ালা জনৈক ছাহাবীকে 'যুল ইয়াদায়ন' বলা হত ইত্যাদি। তাঁরা যেহেতু এ রকম উপনামে ডাকার বিষয়ে আপত্তি প্রকাশ করেননি বা অসন্তুষ্ট ছিলেন না, বরং সন্তুষ্টই ছিলেন; সেহেতু তাদেরকে ঐ নামে ডাকায় কোন দোষ নেই। বন্ধুত্ব কিসের দ্বারা সুদৃঢ় হয়? এমন এক প্রশ্নের উত্তরে ওমর (রাঃ) বলেন, 'বন্ধুকে উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন কর'।^{১২৮} তাই সর্বাবস্থায় মানুষকে তার উৎকৃষ্ট নামে সম্বোধন করা উচিত। তাহলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায়, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৬. প্রশংসা বা কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

কৃতজ্ঞতা দুই প্রকার। এক- আল্লাহর কৃতজ্ঞতা। দুই- বান্দার কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ প্রত্যেক মানুষকে প্রতিমূহূর্তে তাঁর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে নানাভাবে যে অফুরন্ত নে'মত ও সহযোগিতা করে যাচ্ছেন, এজন্য আজীবন তাঁর কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেও শেষ করা যাবে না। সে কারণে সর্বাবস্থায় বলতে হবে 'আল-হামদুলিল্লাহ' (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য)। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ (হে নবী!) আপনি বলুন, مَا أُنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ عَبْدٍ (সকল প্রশংসা আল্লাহর)।^{১২৯} রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

১২৬. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১।

১২৭. আব্দুদাউদ, হাদীছ নং ৪৯৬২; ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৩৭৪১, হাদীছ ছহীহ 'লকব' অনুচ্ছেদ।

১২৮. বুয়রম জাহ মুরাদ, ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক, ১৯৯৯, পৃ. ৯০।

১২৯. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ১১১।

‘আল্লাহ কোন নعمة فقال: الْحَمْدُ لِلَّهِ، إِلَّا كَانَ الَّذِي أَعْطَاهُ أَفْضَلَ مِمَّا أَخَذَ. বান্দাকে কোন নে‘মত দিলে সে যদি ‘আল-হামদুলিল্লাহ’ বলে, তাহলে সে যা বলল, তার গ্রহণকৃত বিষয়ের চেয়ে তা উত্তম’।^{১৩০}

অন্যত্র মহান আল্লাহ কৃতজ্ঞতা স্বীকারের প্রতি গুরুত্বারোপ করে বলেন, فَادْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. ‘অতঃপর তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমি তোমাদের স্মরণ করব। আর তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর এবং আমার আদেশ লঙ্ঘন কর না’।^{১৩১} তিনি আরো বলেন, لَنْ شُكْرُكُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَنْ كُفْرُكُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. ‘তোমরা যদি আমার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর, তোমাদেরকে আমি আরো অধিক দিব। আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর’।^{১৩২} আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও কঠোর নির্দেশ প্রদান করেছেন এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করারও সুসংবাদ দিয়েছেন। যেমন-

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَى عَنِ الْعَبْدِ يَأْكُلُ الْأَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَبُ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا.

হযরত আনাস (রাযিমালাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এরশাদ করেন, ‘আল্লাহ তাঁর সেই বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন, যে খাদ্য গ্রহণের সময় আল্লাহর প্রশংসা করে এবং পানীয় পানের সময়ও তাঁর প্রশংসা করে’।^{১৩৩} সুতরাং সর্বাবস্থায় আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত।

পক্ষান্তরে কোন ব্যক্তি যদি কাউকে সামান্য পরিমাণও কোন উপকার বা সহযোগিতা করেন, তখন তার প্রতি সানন্দচিত্তে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা অবশ্যই কর্তব্য। এতে একদিকে যেমন উক্ত ব্যক্তির অন্তরে আরেকজনকে সাহায্য করার ব্যাপারে উৎসাহ সৃষ্টি হবে; অপরদিকে যিনি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলেন, তার প্রতিও একটা আন্তরিক টান বা মুহাব্বত সৃষ্টি হবে। এজন্য রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَقَالَ لِفَاعِلِهِ: جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا, ‘কারো যদি উপকার করা হয়, আর সে যদি فَقَدْ أَبْلَغَ فِي الشُّعْرِ.

১৩০. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৩৮০৫, হাদীছ হাসান।

১৩১. সূরা আল-বাক্বারাহ, আয়াত ১৫২।

১৩২. সূরা ইবরাহীম, আয়াত ৭।

১৩৩. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪২০০; বঙ্গানুবাদ রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ১৩৯৭।

১৩৮. বুখারী, হাদীছ নং ২৬৬৩; মুসলিম, হাদীছ নং ৩০০১।

মিকদাদ ইবনুল আসওয়াদ (রাযীয়াহু-ল্লাহু-আনহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু-আলাইহি-ওআলহি-ওআলমু-আলাইহিমু) বলেছেন, ‘যখন তোমরা অত্যধিক প্রশংসাকারীদেরকে দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে’।^{১৩৯} সুতরাং কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই শরী‘আতের সীমা লঙ্ঘন করা যাবে না।

উল্লিখিত বিষয়গুলো ছাড়াও কোন অজানা বিষয়ে জানতে চাইলে সুন্দরভাবে তার উত্তর দেওয়া, কোন অভিযোগ থাকলে যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে তা খণ্ডন করা, দ্বীনী ভাইয়ের প্রতি সর্বদা ক্ষমার মানসিকতা পোষণ করা, মাঝে-মধ্যে দাওয়াত করা, সময়-সুযোগ মত একত্রে বসে আহার করা, বন্ধুর মন-মানসিকতা বুঝে তার পসন্দনীয় কোন জায়গায় বেড়িয়ে আসা ইত্যাদির মাধ্যমে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি পায় ও সুদৃঢ় হয়। মহান আল্লাহ প্রত্যেক দ্বীনী ভাইকে শারয়ী বিধান যথাযথভাবে অনুসরণের মাধ্যমে পারস্পরিক সৌভ্রাতৃত্বের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শান্তিপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে ইহকালীন জীবনে শান্তি ও পরকালীন জীবনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন।

ভ্রাতৃত্ব নষ্টের কারণসমূহ

ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির যেমন বহুবিধ উপায় আছে, তেমনি ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টেরও নানা কারণ রয়েছে। শয়তান মানব জাতির চিরশত্রু। সে কখনই চায় না মানুষ পরস্পর মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে ধরাপৃষ্ঠে শান্তিতে বসবাস করুক। শয়তানের মূল কাজই হল ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া-ফাসাদ, বিবাদ-বিসম্বাদ লাগিয়ে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করা। তাই প্রত্যেক মুসলমানকে শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে মুক্ত থাকার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। এক্ষেত্রে শয়তান যে সব বিষয়ে কুমন্ত্রণা দিয়ে মানুষকে বিপথগামী করে এবং মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে পারস্পরিক আন্তরিকতা বিনষ্ট করে, সে সব বিষয়ে বেশি বেশি সতর্ক থাকতে হবে। যে কোন আদর্শ বা আন্দোলন ধ্বংশের অন্যতম কারণ হল উক্ত আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্কে ফাটল ধরান। তাই ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বিনষ্টের কিছু কারণ নিম্নে উল্লেখ করা হল-

১. গীবত করা :

‘গীবত’ আরবী শব্দ, যার অর্থ পরনিন্দা, দোষচর্চা ইত্যাদি। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে তার অনুপস্থিতিতে এমন কথা বলা, যা শুনলে সে মনে কষ্ট পায় তাকে গীবত বলে। ইসলামী শরী‘আতে গীবত অত্যন্ত গর্হিত কাজ। এর মাধ্যমে মানব মনে পারস্পরিক আত্মবিশ্বাসের ঘাটতি ঘটে, ফলে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে ফাটল ধরে। কোন মানুষ ভুলের উর্ধ্বে নয়। কিন্তু কেউ চায় না যে, তার দোষ-ত্রুটি নিয়ে অন্যে তার অগোচরে সমালোচনায় লিপ্ত হোক। এর দ্বারা একদিকে যেমন সমালোচিত ব্যক্তি মনঃপীড়ায় দগ্ধ হয়, অনুরূপ সমালোচনাকারী সম্পর্কে তার হৃদয়ে ঘৃণার উদ্বেগ হয়। পরিণামে পারস্পরিক আস্থা ও নির্ভরশীলতার সমুদ্রে ভাটার টান পড়ে। পবিত্র কুরআনে গীবতকে আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খাওয়ার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَا يَتَّبِعْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيَحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ আর তোমরা একে অপরের

গীবত কর না। তোমরা কি কেউ আপন মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ কর? অবশ্যই তা ঘৃণা কর। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই তিনি তওবা কবুলকারী ও দয়ালু’।^{১৪০} গীবতের পরিণতি সম্পর্কে মহান আল্লাহ আরো বলেন, ‘وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ’ ‘দুর্ভোগ তাদের যারা সম্মুখে ও পশ্চাতে লোকের নিন্দা করে’।^{১৪১}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ও গীবতের বিভিন্ন দিক ও ধরন উল্লেখপূর্বক এর ভয়াবহ পরিণতি এবং এ থেকে বেঁচে থাকার জন্য ছাহাবায়ে কেরামকে কঠোরভাবে হুঁশিয়ার করে গেছেন। যেমন-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَتَذَرُونَ مَا الْغِيَّةُ قَالُوا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَهُ، فَيَلْ أَوْرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُولُ، قَالَ إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ اغْتَبْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدْ بَهْتُهُ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) ছাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জান গীবত কি? তাঁরা বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই অধিক জানেন। তখন তিনি বললেন, তোমার কোন ভাই সম্পর্কে তার অগোচরে এমন কথা বলা যা সে অপসন্দ করে। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, আমি যা বলি তা যদি আমার ভাইয়ের মধ্যে থাকে, তাহলে? তখন তিনি বললেন, তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে, তাহলে তুমি তার গীবত করলে। আর তুমি যা বল তা যদি তার মধ্যে না থাকে, তবে তুমি তার নামে মিথ্যা অপবাদ আরোপ করলে’।^{১৪২}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ أَكْلَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ ‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিম ভাইয়ের একবার গোশত ভক্ষণ (গীবত) করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে তার অনুরূপ শাস্তি আন্বাদন করাবেন’।^{১৪৩}

১৪০. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।

১৪১. সূরা আল-হুমাযাহ, আয়াত ১।

১৪২. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮২৮।

১৪৩. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৮১, ‘গীবত’ অনুচ্ছেদ, হাদীছ ছহীহ।

অশ্লীলতা দু'ভাবে হতে পারে। ১. কথার মাধ্যমে এবং ২. কর্ম বা আচরণের মাধ্যমে। উভয় প্রকার অশ্লীলতাই সর্বের অপসন্দনীয় এবং নিন্দনীয়। অশ্লীল ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে রাসূল (ﷺ)-এর ঘোষণা সুস্পষ্ট। তিনি বলেন,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রাযিরাজা-৭) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'মুমিন ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, ভৎসনাকারী, লানতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদ-স্বভাবের হতে পারে না'।^{১৪৭} অপর হাদীছে আছে,

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَفَعَهُ : لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلَا اللَّعَّانِ وَلَا الْفَاحِشِ وَلَا الْبَذِيءِ.

ইবনে মাসউদ (রাযিরাজা-৭) মারফু সূত্রে (রাসূলুল্লাহ (ﷺ) হতে বর্ণনা করে বলেন, 'মুমিন গঞ্জনাদানকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইত্যর প্রকৃতির হয় না'।^{১৪৮} এরূপ স্বভাবের ব্যক্তিকে কেউ পসন্দ করে না। এমনকি মহান আল্লাহও তাদের ঘৃণা করেন। হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ.

আবু দারদা (রাযিরাজা-৭) হতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা অশ্লীলভাষী, নির্লজ্জ ইত্যরকে ঘৃণা করে থাকেন'।^{১৪৯} অপর হাদীছে আছে-

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلَّا شَأْنُهُ، وَمَا كَانَ الْحَبَاءُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانُهُ.

হযরত আনাস (রাযিরাজা-৭) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এরশাদ করেন, 'অশ্লীলতা যে কোন বস্তুকে কলুষিত করে দেয় এবং লজ্জাশীলতা কোন বস্তুকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে'।^{১৫০} তিনি আরো বলেন,

১৪৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৭৭, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮৪৭, হাদীছ ছহীহ।

১৪৮. তিরমিযী, বুলুগুল মারাম, বাংলা, হাদীছ নং ১৫১৬, পৃ. ২/২৫৩।

তিরমিযী একে হাসান এবং হাকেম ছহীহ বলেছেন।

১৪৯. তিরমিযী, হাদীছ নং ২০০২; মিশকাত, হাদীছ নং ১৯৪৭, হাদীছ ছহীহ।

রাসূল (ﷺ) আরো বলেন, **إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مَا يَتَّبِعُن فِيهَا زِلْ**
بَهَا 'বান্দা যখন ভালমন্দ বিচার না করেই কোন কোন কথা বলে, তখন তার কারণে সে নিজেকে জাহান্নামের
 এতদূর গভীরে নিয়ে যায়, যা পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্বের সমান'।^{১৫২} তিনি
 আরো বলেন, **إِنَّ الرَّجُلَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يَرَىٰ بِهَا بَأْسًا**
'যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহর অসন্তুষ্টিসূচক কোন কথা বলে আর তাকে কিছুই মনে করে না, তাহলে সে
জন্য তাকে জাহান্নামের আগুনে সত্তর বছরের দূরত্বে নিক্ষেপ করা হবে'।^{১৫৩}
 তাই না বুঝে বা ভালমন্দ বিচার-বিশ্লেষণ না করে কোন কথা বলা মারাত্মক
 ক্ষতির কারণ হতে পারে।

অশ্লীল কথাবার্তা খারাপ চরিত্রের লক্ষণ। কাম-প্রবৃত্তি তাড়িত হয়ে মানুষ সাধারণত অশ্লীল কথা বলে থাকে। আবার ক্রোধের বশবর্তী হয়েও মানুষ এ ধরনের অশালীন কথাবার্তা বলে থাকে। ইসলামী শরী'আতে অশালীন ও অশ্লীল কথাবার্তা বলা নিষিদ্ধ। এহেন ঘৃণ্য কর্মে যারা অভ্যস্ত নিরীহ জনসাধারণ তাদেরকে অন্তর থেকে ঘৃণা করে এবং পারতপক্ষে

১৫৩. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৩৯৭০, হাদীছ ছহীহ।

তাদেরকে 'এড়িয়ে চলার চেষ্টা করে। কেননা আয়েশা(রাঃ) বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেন, 'إِنَّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ', 'হে আয়েশা! নিকৃষ্টতম লোক হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যাকে তার অশ্লীলতার জন্য লোকে পরিত্যাগ করে বা বর্জন করে'।^{১৫৪} তাই আল্লাহর সম্ভ্রুষ্টি এবং মানুষের ভালবাসা প্রাপ্তি এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় রাখার লক্ষ্যে প্রত্যেক মুমিনের সকল প্রকার অশ্লীলতা পরিহার করা অত্যন্ত জরুরী।

একদা কতিপয় ইহুদী রাসূলুল্লাহ(সঃ)-এর কাছে এসে বলল, 'আস-সামু আলায়কুম'- 'তোমার মৃত্যু হোক'। আয়েশা(রাঃ) তখন বলেন, তোমাদেরই মৃত্যু হোক। আল্লাহ তোমাদের উপর লানত করুন এবং তোমাদের উপর ক্রুদ্ধ হোন। একথা শুনে রাসূলুল্লাহ(সঃ) বললেন, 'مَهْلًا يَا خَافِئَةُ', 'থাম হে আয়েশা! তোমার নম্রতা অবলম্বন করা উচিত। রুঢ়তা ও অশ্লীলতা থেকে বেঁচে থাক'।^{১৫৫}

রাসূলুল্লাহ(সঃ) আরো বলেন, 'مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكَلِّمْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ', 'যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস পোষণ করে সে যেন ভাল কথা বলে অথবা চুপ থাকে'।^{১৫৬}

অশ্লীলতা পরিহার করে ভাল কথা বলার ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ(সঃ) বলেন, 'إِنَّ فِي الْحِجَّةِ غُرْفًا تُرَى ظُهُورُهَا مِنْ بُطُونِهَا وَبُطُونُهَا مِنْ ظُهُورِهَا', 'জান্নাতে এমন কতগুলো ঘর রয়েছে যার বহির্দেশ ভিতর থেকে এবং অভ্যন্তরভাগ বাইরে থেকে দেখা যাবে'। একজন বেদুঈন একথা শুনে জিজ্ঞেস করল, সেগুলো কার জন্য হে আল্লাহর রাসূল! তিনি বললেন, 'لِمَنْ أَطَابَ الْكَلَامَ، وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، وَأَدَامَ الصِّيَامَ، وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ', 'যে ভাল কথা বলে, (দরিদ্রদের) খাদ্য দান করে, ধারাবাহিকভাবে ছিয়াম পালন করে এবং মানুষ তন্দ্রাবিভোর থাকা অবস্থায় রাতের গভীর নির্জনতায় ছালাত আদায় করে তার জন্য'।^{১৫৭}

১৫৪. বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৯৬, আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৩১১।

১৫৫. বুখারী, হাদীছ নং ৬০৩০ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৮।

১৫৬. বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৭৫।

১৫৭. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৮৪, হাদীছ হাসান।

সুতরাং একদিকে অশ্লীলতা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় কালেই মানুষকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অপরদিকে ভাল কথা, নম্রতা ইত্যাদি স্বভাব মানুষকে উভয় কালেই সফলতা বয়ে আনে। তাই প্রত্যেকের অশ্লীলতার পথ পরিহার করা উচিত।

৩. মিথ্যা কথা বলা :

মিথ্যাবাদী ব্যক্তি মাত্রই সমাজে নিন্দিত, ঘৃণিত ও উপেক্ষিত। মানুষ পারতপক্ষে এ ধরনের ব্যক্তি থেকে সর্বদা দূরে থাকার চেষ্টা করে। কেননা মিথ্যাবাদীর সাথে চলাফেরা বা তাকে অনুসরণ করতে স্বয়ং আল্লাহই নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, **فَلَا تُطِيعُ الْمُكَذِّبِينَ** ‘আর তোমরা মিথ্যাবাদীদেরকে অনুসরণ কর না’।^{১৫৮}

সত্য ও মিথ্যার সুফল ও কুফল উল্লেখ করে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صَدِيقًا، وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا.

‘তোমরা সত্যকে আঁকড়ে ধর। কেননা সত্য পুণ্যের পথ দেখায়। আর পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি সর্বদা সত্য কথা বলে এবং সত্য বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহর কাছে তাকে ‘ছিদ্দীক্’ বলে লিপিবদ্ধ করা হয়। আর তোমরা মিথ্যা হতে বেঁচে থাক। কেননা মিথ্যা পাপাচারের পথে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। যে ব্যক্তি সর্বদা মিথ্যা কথা বলে এবং মিথ্যা বলতে চেষ্টা করে, আল্লাহর দরবারে তাকে ‘কায্যাব’ (মহা মিথ্যাবাদী) বলে লিপিবদ্ধ করা হয়’।^{১৫৯}

আব্দুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করা হল, সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, **صَدُوقٌ**, **كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبِ**, **اللسان، قالوا: صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقى**

‘প্রত্যেক ‘মাখমুমুল ক্বলব’ ও ‘লা ইন্ম ফিহে’ وَلَا بَعَى وَلَا غِلَّ وَلَا حَمَدٌ। সত্যবাদী। ছাহাবীগণ বললেন, সত্যবাদীকে আমরা জানি। কিন্তু ‘মাখমুমুল ক্বলব’ কে? তিনি বললেন, সে হচ্ছে মুত্তাকী ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ব্যক্তি। তার মধ্যে কোন পাপ নেই, সীমালংঘন নেই এবং হিংসা-বিদ্বেষ নেই’।^{১৬০}

মিথ্যা কথা বলা মুনাফিকের লক্ষণ। যেমন হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثٌ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أُوْتِمِنَ خَانَ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘মুনাফিকের লক্ষণ তিনটি। যখন সে কথা বলে, মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে খেলাপ করে এবং যখন আমানত রাখা হয় তখন খেয়ানত করে’।^{১৬১}

অনেকে নিতান্ত ঠাট্টা বা রসিকতার ছলে মিথ্যা বলে থাকে। কিন্তু ইসলামী শরী‘আতে তারও কোন অনুমোদন নেই; বরং তা আত্মবিধ্বংসী কাজ। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, وَيَلُّ لِمَنْ يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ ‘সে ব্যক্তির জন্য ধ্বংস যে কথা বলে এবং জনতাকে হাসানোর জন্য মিথ্যা কথা বলে। তার জন্য ধ্বংস, তার জন্য ধ্বংস’।^{১৬২} রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, أَنَا زَعِيمٌ بَيْتٍ فِي رَبْضِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْمِرَاءَ وَإِنْ كَانَ مُحِقًّا، وَبَيْتٍ فِي وَسْطِ الْجَنَّةِ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَارْحًا، وَبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسَنَ خُلُقَهُ ‘যে ব্যক্তি ন্যায়ের ওপর থাকা সত্ত্বেও ঝগড়া-ফাসাদ পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের এক প্রান্তের একটি ঘরের আমি নেতা হব, কৌতুকছলে হলেও যে মিথ্যা পরিহার করে তার জন্য জান্নাতের মাঝখানের একটি ঘরের আমি নেতা হব এবং চরিত্রবান ব্যক্তির জন্য জান্নাতের সর্বোচ্চ স্থানের একটি ঘরের আমি নেতা হব’।^{১৬৩}

১৬০. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৪২১৬, হাদীছ ছহীহ।

১৬১. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫৫।

১৬২. আহমাদ, তিরমিযী, হাদীছ নং ২৩১৫; আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৯৯০;

দারেমী, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮৩৪, হাদীছ হাসান।

১৬৩. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৮০০, সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ নং ২৭৩, হাদীছ ছহীহ।

কোন ব্যক্তি যখন মিথ্যা বলতে থাকে অবশেষে আল্লাহ তাকে মিথ্যাবাদীদের তালিকাভুক্ত করেন।^{১৬৫}

উপরোক্ত আলোচনা থেকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, দুনিয়া ও আখেরাত উভয় ক্ষেত্রেই মিথ্যা অত্যন্ত ক্ষতিকর। দুনিয়াবী জীবনে যেমন মিথ্যাবাদী ব্যক্তিকে কেউ পসন্দ করেন না, অনুরূপ পরকালেও এর জন্য চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হবে। অতএব এ বিষয়ে আমাদের আরো সাবধান হতে হবে।

৪. অহেতুক কু-ধারণা করা :

প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন মুসলমান সম্পর্কে কু-ধারণা বা অহেতুক খারাপ ধারণা পোষণ করা অন্যায়। ধারণাভিত্তিক বলা ও চলা অধিকাংশ বিভ্রান্তি ও বিবাদের মূল কারণ। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের বর্ণনা মতে ধারণা করে কথা বলা বা ধারণার অনুসরণ করা ইহুদী-নাছারা তথা বিধর্মী বা বেদ্বীনদের কাজ। কোন হকুপছী মুসলমানের স্রেফ ধারণার উপর ভিত্তি করে কিছু বলা বা করা সমীচীন নয়। মহান আল্লাহ মুশরিকদের স্বভাব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, 'إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ' 'তারা তো শুধু ধারণারই অনুসরণ করে এবং তারা শুধু মিথ্যাই বলে'।^{১৬৬} তিনি আরো বলেন, 'وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا' 'তারা অধিকাংশ অনুমানেরই অনুসরণ করে। কিন্তু সত্যের বিপরীতে অনুমানের কোন মূল্য নেই'।^{১৬৭} এ বিষয়ে মহান আল্লাহ স্বয়ং তাঁর নবীকে সতর্ক করে বলেন, 'وَإِنْ تُطِيعُوا أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ' 'যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো শুধু ধারণার অনুসরণ করে এবং অনুমানভিত্তিক কথা বলে'।^{১৬৮} বিশেষ করে কোন ব্যক্তি সম্পর্কে না বুঝে বা না শুনে কু-ধারণা করা মহা পাপ, যা কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ.

১৬৫. বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুস সালেহীন, চতুর্থ খণ্ড, বাংলা, হাদীছ নং ১৫৪৩।

১৬৬. সূরা ইউনুস, আয়াত ৬৬।

১৬৭. সূরা ইউনুস, আয়াত ৬৬।

১৬৮. সূরা আল-আন'আম, আয়াত ১১৬।

‘হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয়ই কতক ধারণা পাপ’।^{১৬৯} একই ভাবে হাদীছে এসেছে-

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘তোমরা অহেতুক ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা ধারণা জঘন্যতম মিথ্যা’।^{১৭০}

কোন ব্যক্তি যখন কারো সম্পর্কে নিছক অনুমানের উপর ভিত্তি করে কোন বিষয়ে সন্দেহ করে, তখন তাদের মধ্যে আস্থা ও নির্ভরশীলতা কমে যায়। ফলে মনে দূরত্ব সৃষ্টি হয়। যা কোন মুসলমানের জন্য কাম্য নয়। পারস্পরিক কাজ-কর্ম ও লেনদেনে স্বচ্ছতা থাকলে অহেতুক ধারণা পরিহার করা সম্ভব। এ বিষয়ে হযরত সালমান বলেন, ‘আমি খাদেমের কাছে কোন বস্তু দেওয়ার সময় শুনে দেই, যাতে কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকতে পারি’।^{১৭১} তাই অহেতুক কু-ধারণা থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক মুমিনের অবশ্য কর্তব্য।

৫. চোগলখুরী করা :

কোন বিষয়ে একজনের নিকটে এক কথা, আবার অন্য জনের নিকটে আরেক কথা বলাকে চোগলখুরী বলে। এটি ইসলামী শরী‘আতে হারাম। যারা এহেন গর্হিত কাজে লিপ্ত তারা চতুরতার আড়ালে নিজেদের প্রকৃত রূপটা লুকিয়ে রাখে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنْ اللَّهِ. ‘এরা লোকদের কাছ থেকে নিজেদের কর্মকাণ্ড আড়াল রাখতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছ থেকে গোপন করতে পারে না’।^{১৭২}

চোগলখোরের চূড়ান্ত পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে। যেমন-

عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَاتٌ.

১৬৯. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।

১৭০. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫০২৮।

১৭১. আল-আদাবুল মুফরাদ, বাংলা, হাদীছ নং ১৬৮।

১৭২. সূরা আন-নিসা, আয়াত ১০৮।

হুয়ায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূল (সঃ)-কে বলতে শুনেছি, ‘চোগলখোর জালাতে প্রবেশ করবে না’।^{১৭৩}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجِدُونَ شَرَّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَوْلَاءَ بِوَجْهِ وَهَوْلَاءَ بِوَجْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, ‘তোমরা কিয়ামতের দিন সর্বাপেক্ষা মন্দ লোক ঐ ব্যক্তিকে পাবে, যে দ্বিমুখী। সে এক মুখ নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক মুখ নিয়ে ওদের কাছে আসে’।^{১৭৪} কিয়ামতের দিন চোগলখোরের জিহ্বা হবে আগুনের। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ ذَا وَجْهَيْنِ فِي الدُّنْيَا كَانَ لَهُ لِسَانَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِّنْ نَّارٍ.

আম্মার (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি দুনিয়াতে দ্বিমুখী, কিয়ামতের দিন তার আগুনের দু’টি জিহ্বা হবে’।^{১৭৫} অপর হাদীছে আছে-

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدٍ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ قَالُوا بَلَى، الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذَكَرَ اللَّهُ، أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِشَرَّارِكُمْ؟ قَالُوا بَلَى، قَالَ: الْمَشَاوُونَ بِالتَّمِيمَةِ الْمُفْسِدُونَ بَيْنَ الْأَحِبَّةِ، الْبَاغُونَ الْبُرَاءَ الْعَنَتَ.

আসমা বিনতু ইয়াযীদ (রাঃ) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল (সঃ) বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদের মধ্যকার সর্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তিদের সম্পর্কে অবহিত করব না? হাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, তারা ঐ সকল লোক যাদেরকে দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়। তিনি আরো বললেন, ‘আমি কি তোমাদের মধ্যকার নিকৃষ্টতম লোকদের সম্পর্কে অবহিত করব না? হাহাবীগণ বললেন, হ্যাঁ। তখন তিনি বললেন, ‘যারা চোগলখুরী

১৭৩. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮২৩।

১৭৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮২২।

১৭৫. আবুদাউদ, হাদীছ নং ৪৮৭৩ ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ১৩১০; সিলসিলা হুহীহা, হাদীছ নং ৮৮৯, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮৪৬, হাদীছ হাসান।

করে বেড়ায়, বন্ধুদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করে এবং পুণ্যবান লোকদের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায়’।^{১৭৬}

চোগলখোরের শাস্তি সম্পর্কে হাদীছে এসেছে,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ! بَلَى إِنَّهُ كَبِيرٌ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِالتَّمِيمَةِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَرُ مِنْ بَوْلِهِ.

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত। একদা রাসূল (সঃ) দু’টি কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, এ দুই ব্যক্তিকে আযাব দেওয়া হচ্ছে। কোন বড় পাপের কারণে তাদের আযাব হচ্ছে না। তবে হ্যাঁ, বিষয়টি বড়। তাদের একজন চোগলখুরী করে বেড়াত, আরেকজন প্রস্রাবের সময় পর্দা করত না’।^{১৭৭}

وَإِلَّا، পবিত্র কুরআনে এদের ব্যাপারে সতর্ক করে মহান আল্লাহ বলেন, وَأَرِ الْوَسْوَاسَ الْخَفِيَّ أَنْ يَنْفَعَكَ مِنْهُ، هَمَّازٌ مَشَاءَ بَنِي مِمْ ‘আর তোমরা তার অনুসরণ কর না, যে কথায় কথায় কসম করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে নিন্দাকারী, যে একের কথা অন্যকে লাগিয়ে বেড়ায়’।^{১৭৮}

যারা দ্বিমুখী তাদেরকে মানুষ বিশ্বাস করে না, তাই তাদের সাথে কেউ কোন বন্ধুত্ব বা সম্পর্ক গড়তে চায় না। সুতরাং প্রত্যেক মুমিনের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতের সার্বিক কল্যাণ ও অকল্যাণের কথা বিবেচনায় রেখে চোগলখুরীর পথ পরিহার করা উচিত।

৬. যুলুম বা অত্যাচার করা :

কোন বস্তুকে উপযুক্ত অবস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে অনুপযুক্ত স্থানে রাখাকে (وضع الشيء في غير محله) যুলুম বলে। স্বভাবগতভাবে মানুষের অন্তর আল্লাহকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার কারণে মানুষ যখন তার বিপরীত কিছুকে কল্পনা বা বিশ্বাস করে অথবা অন্তরে স্থান দেয়, তখন তা স্বভাববিরোধী হওয়ার কারণে যুলুমের পর্যাযভুক্ত

১৭৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৩২৩; আত-তা’লীকুর রাগীবি ৩/২৬০, ২৯৫, হাদীছ হাসান।

১৭৭. বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানু. রিয়াযুছ ছালেহীন, হাদীছ নং ১৫৩৮; মিশকাত, হাদীছ নং ৩৩৮।

১৭৮. সূরা আল-কলম, আয়াত ১০-১১।

ব্যক্তিই তো নিঃস্ব যার টাকা-কড়ি ও ধন-সম্পদ নেই। তখন নবী করীম (ﷺ) বললেন, ‘যে দুনিয়া হতে ছালাত, ছিয়াম ও যাকাত আদায় করে আসবে এবং সাথে ঐ সকল লোকেরাও আসবে, সে কাউকে গালি দিয়েছে, কারো অপবাদ রটিয়েছে, কারো মাল-সম্পদ গ্রাস করেছে, কাউকে হত্যা করেছে এবং কাউকে প্রহার করেছে। সুতরাং ঐই হক্‌দারকে তার নেকী প্রদান করা হবে, ঐ হক্‌দারকে তার নেকী প্রদান করা হবে। এভাবে সকল হক্‌দারের হক পরিশোধ করার পূর্বে যদি তার নেকী নিঃশেষ হয়ে যায়, তখন তাদের গোনাহসমূহ ঐ ব্যক্তির উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে। অবশেষে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে’।^{১৮২} এ কারণেই রাসূল (ﷺ) এ ব্যাপারে মুসলমানদেরকে সতর্ক করেছেন। এ প্রসঙ্গে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيهِ مِنْ عَرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أَخَذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أَخَذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, ‘যে ব্যক্তি তার কোন মুসলমান ভাইয়ের প্রতি সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে তা মাফ করে নেয়; ঐ দিন আসার পূর্বে যে দিন তার নিকটে কোন দিরহাম ও দীনার থাকবে না। যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তাথেকে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেওয়া হবে, আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলুম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে’।^{১৮৩}

মাযলুম এবং আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না। এ জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, ‘أَتَى دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ’।^{১৮৪} ‘তুমি মাযলুমের বদদো‘আ থেকে বেঁচে থাক। কেননা মাযলুমের বদদো‘আ ও আল্লাহর মধ্যে কোন পর্দা থাকে না’।^{১৮৪}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্য হাদীছে বলেন, ثَلَاثٌ دَعَوَاتٌ مُسْتَجَابَةٌ لِأَشْكَ تین فِیْهِنَّ، دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ، وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ، وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ عَلَى وَلَدِهِ.

১৮২. মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৮১; মিশকাত, হাদীছ নং ৫১২৭।

১৮৩. বুখারী, মিশকাত, হাদীছ নং ৫১২৬।

১৮৪. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ১৭৭২।

ব্যক্তির দো'আ সন্দেহাতীতভাবে কবুল হয়ে থাকে। ১. মায়লূমের দো'আ ২. মুসাফিরের দো'আ ও ৩. সন্তানের জন্য পিতার দো'আ।^{১৮৫} তিনি (ﷺ) আরো বলেন, دَعْوَةُ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا، فَفُجِّرُهُ عَلَى نَفْسِهِ. 'মায়লূমের দো'আ কবুল হয়ে থাকে। যদি সে পাপাচারী হয় তবুও। (এমতাবস্থায়) তার পাপ তার উপর বর্তাবে'।^{১৮৬}

যুলুম করা বা যুলুম থেকে বেঁচে থাকার জন্য রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এ দো'আটি পড়তেন-

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُكَ مِنَ الْفَقْرِ، وَأَعُوذُكَ مِنَ الْفَلَةِ وَالذَّلَّةِ، وَأَعُوذُكَ أَنْ أَظْلَمَ أَوْ أَظْلَمَ.

‘আল্লাহ্‌ন্যা ইন্নী আউযুবিকা মিন ফাকরি, ওয়া আউযুবিকা মিনাল কিয়্যাতি ওয়ায বিয়্যাতি, ওয়া আউযুবিকা আন আযলিমা আও উযলামা’। অর্থাৎ ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দারিদ্র্য, স্বল্পতা, লাঞ্ছনা এবং কারো প্রতি যুলুম করা বা যুলুমের শিকার হওয়া হতে আশ্রয় প্রার্থনা করছি’।^{১৮৭}

পৃথিবীতে মানব সৃষ্টির শুরু থেকে সবলরা দুর্বলের উপর নানাভাবে অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে আসছে। অথচ এটি একটি জঘন্যতম ও কঠোর শাস্তিযোগ্য অপরাধ। অত্যাচারী ব্যক্তিকে যেমন আল্লাহ পসন্দ করেন না, তেমনি মানুষও তাকে অপসন্দ করে। এ কারণে যারা অত্যাচারী তাদের থেকে মানুষ সর্বদা দূরে অবস্থান করে।

৭. আমানতের খেয়ানত করা :

আমানতদারী একটি মহৎ গুণ। ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সকল ক্ষেত্রে আমানত রক্ষায় ইসলামী শরী'আত বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছে। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا, ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রকৃত হক্‌দারকে প্রত্যর্পণ করতে’।^{১৮৮} পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নিজেই প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তির পরিচয় ও গুণাবলী উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ

১৮৫. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯০৫ ‘সদ্যবহার ও আত্মীয়তার

সম্পর্ক রক্ষা করা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭, হাদীছ হাসান।

১৮৬. আহমাদ, হাদীছ নং ২/৩৬৭; হুহীহল জামে, হাদীছ নং ৩৩৮২, হাদীছ হাসান।

১৮৭. নাসাই, হাদীছ নং ৫৪৬০, ‘আশ্রয় প্রার্থনা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-১৪, হাদীছ হুহীহ।

১৮৮. সূরা আন-নিসা, আয়াত ৫৮।

‘আর যারা নিজেদের আমানত ও ওয়াদা রক্ষা করে’।^{১৮৯} মুনাফিকের লক্ষণের মধ্যে একটি অন্যতম লক্ষণ হল, وَإِذَا أُؤْتِمِنَ حَانَ, ‘তার কাছে আমানত রাখলে খিয়ানত করে’।^{১৯০}

আমানতের খেয়ানত করা ক্রিয়ামতের আলামত। ক্রিয়ামতের পূর্বে আমানত উঠে যাওয়া সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন,

يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ مِثْلِ الْوَقْتِ، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتَقْبِضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ، فَيَظِلُّ أَثَرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ، كَجَمْرٍ دَخَرَجَتْهُ عَلَى رِجْلِكَ، فَتَنْفُطُ فَتَرَاهُ مُتَبَيَّرًا وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ، فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ حَتَّى يُقَالَ: إِنَّ فِي بَنِي فُلَانٍ رَجُلًا أَمِينًا، حَتَّى يُقَالَ لِلرَّجُلِ: مَا أَعْقَلَهُ! وَمَا أَظْرَفَهُ! وَمَا أَجْلَدَهُ! وَمَا فِي قَلْبِهِ مِنْ ثِقَالٍ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ إِيْمَانٍ.

‘কোন ব্যক্তি নিদ্রা গেল, তখন তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে, তখন একটি বিন্দুর মত চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। আবার ঘুমাবে। তখন আবার তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর তার চিহ্ন ফোকার মত অবশিষ্ট থাকবে। তোমার পায়ের উপর গড়িয়ে পড়া অঙ্গার সৃষ্ট চিহ্ন, যাকে তুমি ফোলা মনে করবে, প্রকৃতপক্ষে তাতে কিছুই থাকবে না। মানুষ বেচাকেনা করতে থাকবে বটে, কিন্তু কেউ আমানত আদায় করবে না। তারপর লোকেরা বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। সে ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হবে যে, সে কতই না জ্ঞানী, কতই না হুঁশিয়ার, কতই না বাহাদুর? অথচ তার অন্তরে সরিষা দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না’।^{১৯১}

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) অন্যত্র বলেন, إِذَا ضَيَّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ. ‘যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে তখন ক্রিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেক’। আবু হুরায়রা (رضي الله عنه) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমানতের খেয়ানত করা হবে? রাসূলুল্লাহ (ﷺ) জবাবে বললেন, إِذَا أَسْنَدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ,

১৮৯. সূরা আল-মুমিনুন, আয়াত ৮; সূরা আল-মা‘আরিজ, আয়াত ৩২।

১৯০. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫৫।

১৯১. বুখারী, হাদীছ নং ৬৪৯৭, ‘রিকাবু’ অধ্যায়; মুসলিম, হাদীছ নং ২৩০ ‘ঈমান’ অধ্যায়।

‘যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে কোন অপবাদ দিয়ে তার মর্যাদাহানি করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামের সেতুতে আটকে দিবেন। যতক্ষণ না সে যা বলেছিল তা বের করে দেয়’।^{১৯৯} পক্ষান্তরে প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব হল, তার অপর ভাইয়ের মান-সম্মান রক্ষা করা। এ মর্মে হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ رَدَّ عَنْ عَرَضِ أَخِيهِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবু দারদা (রাঃ) নবী করীম (সঃ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, ‘যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মান রক্ষা করল, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার মুখমণ্ডলকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করবেন’।^{২০০}

যে ব্যক্তি মানুষের মান-সম্মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলে, তারা পরকালীন জীবনে শাস্তি ভোগ করার আগে দুনিয়াবী জীবনেও জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১০. ছিদ্রাশ্বেষণ করা :

মানুষ মাত্রই কোন না কোন দোষে দোষী। শয়তানের কুমন্ত্রণার শিকার হয়ে কোন ব্যক্তি যখন কোন অপরাধ করে, পরক্ষণে তার বিবেক জাগ্রত হওয়ার সাথে সাথে সে সারাক্ষণ উক্ত অপরাধের জন্য বিবেকের দংশনে জর্জরিত হতে থাকে। লোকচক্ষুর অন্তরালে সে মহান আল্লাহর নিকটে কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাও করে। এহেন দোষত্রুটি খুঁজে বের করাকে ‘ছিদ্রাশ্বেষণ’ বলে। এটি কবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। মহান আল্লাহ বলেন, ‘وَلَا تَحْسَبُوهَا’।^{২০১}

রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, ‘إِنَّكَ إِنْ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كَذَبْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ’।^{২০২} ‘তুমি যদি মানুষের দোষ খুঁজে বেড়াও, তাহলে তুমি তাদেরকে ধ্বংস করলে অথবা প্রায় ধ্বংস করে ছাড়লে’।

যারা মানুষের দোষত্রুটি খুঁজে বেড়ায় জনগণ তাদের থেকে সর্বদা দূরে অবস্থান করে। ফলে মানুষে মানুষে সম্প্রীতি সৃষ্টির পরিবর্তে শত্রুতাই সৃষ্টি হয়। তাই এহেন আচরণ থেকে সকলের দূরে থাকা প্রয়োজন।

১৯৯. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৮৩; মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৮৬, হাদীছ হাসান।

২০০. তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৩১, হাদীছ ছহীহ।

২০১. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২।

২০২. আব্দাউদ, হাদীছ নং ৪৮৮৮, হাদীছ ছহীহ।

১১. উপহাস করা :

কোন ব্যক্তিকে উপহাস বা তিরস্কার করা ইসলামের দৃষ্টিতে নিঃসন্দেহে গর্হিত কাজ। ভারসাম্যপূর্ণ সমাজ বিনির্মাণে প্রত্যেক মুসলমানকে এ সব বদ অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত। কোন মানুষকে হয় প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে তার কোন দোষ এমনভাবে উল্লেখ করা, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে হাসির খোরাক হয়। উপহাস কথায়, ভাবভঙ্গিমায় বা আকার-ইঙ্গিতেও হতে পারে। এরূপ কাজে উপহাসকারী অন্যকে অপমানিত, লাঞ্ছিত ও হয় করার মধ্য দিয়ে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ করে থাকে। ইসলামী শরী‘আতে এটি ঘৃণ্য অপরাধ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ، عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ، وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ.

‘হে মুমিনগণ! কোন পুরুষ যেন অপর কেন পুরুষকে উপহাস না করে; কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। আর কোন নারীও যেন অপর কোন নারীকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিণী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে’।^{২০৩}

মানুষের বাহ্যিক চালচলন ও আচার-আচরণ দেখে তাকে ভাল বা মন্দ বলা কঠিন। তাই দৃশ্যমান কার্যকলাপের মূল্যায়নে কাউকে ভাল বা মন্দ বলা ঠিক হবে না। এ ধরনের উপহাসকারীকে কেউ পসন্দ করে না বিধায় তার থেকে দূরে থাকে। তাই সকলের উচিত কাউকে উপহাস না করা।

১২. তুচ্ছজ্ঞান বা হয় প্রতিপন্ন করা :

মানুষ মাত্রই আল্লাহর সৃষ্টি। সুতরাং একজন আরেকজনকে তুচ্ছ বা হয়জ্ঞান করতে পারে না। যখন কোন ব্যক্তি কাউকে হয়জ্ঞান করে তখন স্বভাবতই সে নিজেকে তার চেয়ে শ্রেয় মনে করে, যা অহংকারের পর্যায়ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদীছে জটনৈক ছাহাবীর এক প্রশ্নের উত্তরে অহংকারের ব্যাখ্যা দিয়ে রাসূল (সঃ) বলেন, ‘الْكِبْرُ بَطْرُ الْحَقِّ وَ غَمَطُ النَّاسِ.’ অহংকার হচ্ছে সত্যকে অস্বীকার করা এবং লোকদের নীচুজ্ঞান করা’।^{২০৪} এ জন্য কথা, কর্ম বা আচরণের

২০৩. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১।

২০৪. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫১০৮।

মাধ্যমে কাউকে তুচ্ছজ্ঞান করা বা হয়ে প্রতিপন্ন করা নিষেধ। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে রাসূল (সঃ) বলেন, **بِحَسَبِ أَمْرِ مَنْ** 'এক ব্যক্তি গোনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে নীচুজ্ঞান করবে'।^{২০৫} অপর হাদীছে আছে, **وَلَا يَخْذُلُهُ وَلَا يَحْفَرُهُ** 'কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে না অপমান করবে, আর না তুচ্ছজ্ঞান করবে'।^{২০৬}

কোন ব্যক্তি যখন কাউকে যেকোন কারণে তুচ্ছজ্ঞান করে, তখন সে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে থাকে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক হৃদয়তার ঘাটতি ঘটে। তাই কোন মুসলমানের পক্ষে কাউকে হেয়জ্ঞান করা মহা অন্যায়।

১৩. ক্ষতিসামন করা :

ক্ষতি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। তবে সাধারণ অর্থে কোন মানুষের দ্বারা অপর মানুষের বাহ্যত যেসব ক্ষতি হওয়া সম্ভব সেগুলোই উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি অপরের ক্ষতিসামন করে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে অভিসম্পাত প্রাপ্ত। রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, **مَنْ ضَارَّ ضَارَّ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاقَّ شَاقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ** 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ক্ষতিসামন করল, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে কষ্ট দিল, আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন'।^{২০৭}

এরূপ ব্যক্তিকে দুনিয়ার মানুষ না ভালবাসে, না তার সাথে মেলামেশা করে। তাই একজন মুসলমানের উচিত দ্বীনী ভাইয়ের কোন প্রকার ক্ষতিসামন না করে সর্বদা তার কল্যাণ কামনা করা। এতে একদিকে যেমন ভালবাসা বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জিত হবে।

১৪. ধোঁকা বা প্রতারণা করা :

কথাবার্তা, লেনদেন, কার্যকলাপ, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি ক্ষেত্রে মানুষকে ধোঁকা দেওয়া ইসলামী শরী'আতে নিষিদ্ধ। জাহেলি যুগের মানুষেরা কথাবার্তা, জিনিসপত্র কেনাবেচার প্রভৃতি ক্ষেত্রে নানা রকম ধোঁকা ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করত। এর মাধ্যমে এক শ্রেণীর মানুষ অন্যায়ভাবে

২০৫. মুসলিম, হাদীছ নং ২৫৬৪।

২০৬. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৯৫৯।

২০৭. ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, হাদীছ নং ১৯৪০; মিশকাত, হাদীছ নং ৫০৪২, হাদীছ হাসান।

লাভবান হত, আরেক শ্রেণীর মানুষ চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হত। কিন্তু রাসূল (ﷺ) এর বিরুদ্ধে চরম হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করলেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ بِأَنْفٍ (১২০৮) হতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, 'যে আমাদের ধোঁকা দিবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়'।^{২০৮} উক্ত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেন, لَا تَنَاجَشُوا (১২০৯) 'মূল্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে ক্রেতার মূল্যের উপর মূল্য বলে তাকে ধোঁকা দিবে না'।^{২০৯} শুধু মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নয়, ভাল দ্রব্যের সাথে খারাপ দ্রব্য মিশিয়ে সবই ভাল বলে বিক্রয় করাও বড় প্রতারণা। এ সব হারাম। প্রতারণাকারীর পরিণতিও ভয়াবহ। যেমন-

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتَرْعِيَهُ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ غَاشٌّ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ.

মা'কিল বিন ইয়াসার হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বলতে শুনেছি, 'আল্লাহ যে বান্দার উপর শাসন কর্তৃত্ব অর্পণ করেন, সে যদি তার অধীনস্তদের সাথে প্রতারণাকারী অবস্থায় মারা যায়, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেন'।^{২১০}

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ غَرٌّ كَرِيمٌ، وَالْفَاجِرُ خَبٌّ لَيْثِمٌ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'ঈমানদার ব্যক্তি হয় উজ্জ্বল চরিত্র সম্পন্ন ও উদারহস্ত আর পাপাচারী লোক হয় শঠ এবং নীচু প্রকৃতির'।^{২১১}

এহেন গরিষ্ঠ ও ক্ষতিকর কাজের সাথে যারা সংশ্লিষ্ট সাময়িকভাবে তারা লাভবান হলেও প্রকৃতপক্ষে তারা সার্বিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। একদিকে যারা তাদের দ্বারা ধোঁকা বা প্রতারণার শিকার হন, তারা সর্বদাই তাকে ঘৃণা করেন। অপর দিকে পরকালেও তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

২০৮. মুসলিম, হাদীছ নং ১৬৪ 'ঈমান' অধ্যায়।

২০৯. বুখারী ও মুসলিম, রিয়াযুস সালেহীন, হাদীছ নং ১৫৮১।

২১০. বুখারী, হাদীছ নং ৭১৫০, 'আহকাম' অধ্যায়; মুসলিম, হাদীছ নং ২২৭ 'ঈমান' অধ্যায়।

২১১. আব্দাউল, হাদীছ নং ৪৭৯০; আল-আদাবুল মুকরাদ, হাদীছ নং ৪১৮, হাদীছ ছহীহ।

তাই নিজেকে সচ্চরিত্রবান হিসেবে গড়ে তোলার জন্য এবং পারম্পরিক ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রাখার লক্ষ্যে ধোঁকা ও প্রতারণার পথ পরিহার করা উচিত।

१६. हिंसा कब्रा :

হিংসা-বিদ্বেষ বা পরশ্রীকাতরতা একটি মারাত্মক ঘৃণ্য ও ক্ষতিকর অভ্যাস। পরশ্রীকাতরতার মধ্যে নিজের প্রাপ্তির চেয়ে অন্যের ক্ষতির কামনাটাই বেশি ক্রিয়াশীল থাকে। ইমাম নববী (র.) এর মতে হিংসা অর্থ কোন ব্যক্তিকে যে অনুগ্রহ দান করা হয়েছে তার ধ্বংস কামনা করা। তাই সেটা দ্বীনী হোক অথবা দুনিয়াবি হোক।^{২২২} যেমন মহান আল্লাহ বলেন, اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ তবে কি তারা অন্যান্য মানবদের প্রতি শুধু এ জন্যই হিংসা পোষণ করে যে, আল্লাহ তাদের বিশেষ অনুগ্রহ প্রদান করেছেন?^{২২৩} তাই ইসলামী শরী'আত হিংসাকে হারাম করেছে। শত্রুতা, অহংকার, ক্ষমতার মোহ প্রভৃতি কারণে একে অপরের প্রতি হিংসা করে থাকে। হিংসাকারীকে যেমন কেউ ভালবাসে না তেমনি হিংসার কারণে মানুষের নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়। হিংসা সম্পর্কে শরীয়তের বিধান স্পষ্ট।

আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শুরুতেই রাসূল (সঃ) বলেন, لَا تَحَاسَدُوا 'তোমরা পরস্পর হিংসা কর না'।^{২১৪} আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীছে তিনি বলেন, وَلَا تَحَسُسُوا وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا تَنَافَسُوا وَلَا تَبَاغُضُوا وَلَا تَذَابِرُوا وَلَا تَنَافَسُوا 'কারো কোন দোষের কথা জানতে চেষ্টা কর না। গোয়েন্দাগিরি কর না। ক্রয়-বিক্রয়ে ধোঁকাবাজি কর না। পরস্পর বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ কর না। একে অন্যের পিছনে লেগে না এবং পরস্পর লোভ-লালসা কর না। রবং আল্লাহর বান্দা হিসেবে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে যাও'।^{২১৫} মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে হিংসুকের হিংসা থেকে পরিত্রাণ কামনায় উৎসাহ দিয়েছেন। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ شَرُّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ 'আর

২১২. রিয়াযুস সলেহীন, বাংলা, পৃ. ৬৫২।

২১৩. সূরা আন-নিসা, আয়াত, ৫৪।

২১৪. মুসলিম, বুলগুন মারাম, হাদীছ নং ১২৯১।

২১৫. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫০২৮।

হিংস্রকের হিংসা থেকে (পরিব্রাণ চাই), যখন সে হিংসা করে’।^{২১৬} শুধু হিংস্রকের হিংসা থেকে নিজের পরিব্রাণ কামনা করলেই চলবে না। সাথে সাথে নিজেকেও অন্যকে হিংসা করা থেকে বিরত রাখতে হবে। তাহলে পরকালে আল্লাহর ক্ষমা পাওয়ার সমূহ সম্ভবনা আছে। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি স্মরণযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ قَالَ كُلُّ مَخْمُومٍ الْقَلْبُ صَدُوقُ اللِّسَانِ قَالُوا صَدُوقُ اللِّسَانِ نَعْرِفُهُ فَمَا مَخْمُومُ الْقَلْبِ قَالَ هُوَ النَّفِيُّ التَّقِيُّ لَا إِيْمَ عَلَيْهِ وَلَا بَغْيٍ وَلَا غِلٍّ وَلَا حَسَدٍ.

আব্দুল্লাহ বিন উমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সঃ) কে জিজ্ঞাসা করা হল সর্বোত্তম ব্যক্তি কে? তিনি বললেন, ‘প্রত্যেক মাখমুমুল ক্বালব ও সত্যবাদী জিহ্বা। ছাহাবীগণ বললেন, সত্যবাদী জিহ্বা বুঝলাম কিন্তু ‘মাখমুমুল ক্বালব’ কে? রাসূল (সঃ) বলেন, সে সেই ব্যক্তি যার আত্মা পবিত্র ও আল্লাহভীরু, যার মাঝে কোন পাপ নেই, শত্রুতা নেই, সংকীর্ণতা নেই এবং হিংসা নেই।^{২১৭}

উল্লেখ্য, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হিংসা করা যাবে সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেন, لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَطَهُ عَلَى هَلَكَةٍ. ‘দুই ব্যক্তি ব্যতীত কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। প্রথম ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং সাথে সাথে তাকে তা সত্যের পথে ব্যয় করার মানসিকতাও দান করেছেন এবং দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ হিকমত দিয়েছেন, সে তা দিয়ে ফায়ছালা করে এবং মানুষকে তা শিক্ষা দেয়’।^{২১৮}

সুতরাং হিংসা-বিদ্বেষের মত ক্ষতিকর অভ্যাস পরিহার করে প্রত্যেক মুসলমানের আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা একান্ত কর্তব্য।

২১৬. সূরা আল-ফালাক্ব, আয়াত ৫।

২১৭. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫২২১।

২১৮. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ২০২।

অহংকার ও আত্মম্ভরিতার ক্ষেত্রে লোকমান হাকীম কর্তৃক স্বীয় পুত্রকে প্রদত্ত উপদেশ পবিত্র কুরআনে বিধৃত হয়েছে। তিনি বলেন, وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ

২২১. সূরা আল-আ'রাফ, আয়াত ১৩।

لِّلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ.
'অহংকারবশে তুমি মানুষের সঙ্গে মুখ ভেংচিয়ে কথা বলবে না এবং পৃথিবীতে অহংকার প্রদর্শন করে বিচরণ করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন আত্মম্ভরি দাস্তিককে পসন্দ করেন না'।^{২২২} মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا.
'ভূপৃষ্ঠে দম্ভভরে বিচরণ করবে না। তুমি তো কখনই পদভারে ভূপৃষ্ঠ বিদীর্ণ করতে পারবে না এবং উচ্চতায় কখনই পর্বত সমান হতে পারবে না'।^{২২৩} প্রচুর প্রাচুর্য ও ঐশ্বর্যের অধিকারী কারাগকে আল্লাহ তার প্রাসাদসহ ভূগর্ভে বিলীন করে দিয়েছিলেন তার দাস্তিকতার কারণে।^{২২৪}

অহংকার সম্পর্কে রাসূল (ﷺ) এর বাণী সুস্পষ্ট।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى الْكِبْرِيَاءُ رِدْءًا يُرَادَى وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي، فَمَنْ تَأَزَّعَنِي وَاحِدًا مِنْهُمَا أَدْخَلْتُهُ النَّارَ وَفِي رِوَايَةٍ قَذَفْتُهُ فِي النَّارِ.

আবু হুরায়রা (রাযিরাহুত্বাহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'অহংকার আমার চাদর এবং শ্রেষ্ঠত্ব আমার ইয়ার। সুতরাং যে ব্যক্তি এর কোন একটি নিয়ে আমার সাথে টানাটানি করবে, আমি তাকে জাহান্নামে ঢুকাব। অপর বর্ণনায় আছে, 'আমি তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব'।^{২২৫} আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রাযিরাহুত্বাহু) হতে বর্ণিত অপর এক হাদীছে রাসূল (ﷺ) বলেন, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِّنْ كِبَرٍ, ... الْكِبَرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمَطُ النَّاسِ. 'যার অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। ... অহংকার হল দম্ভের সাথে সত্যকে পরিত্যাগ করা এবং মানুষকে হেয় ও তুচ্ছ মনে করা'।^{২২৬}

অহংকারীর পরিণতি সম্পর্কে নিম্নোক্ত হাদীছে স্পষ্ট বর্ণনা এসেছে।

২২২. সূরা আল-লোক্‌মান, আয়াত ১৮।

২২৩. সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৩৭।

২২৪. সূরা আল-কাহাফ, আয়াত ৭৬-৮১।

২২৫. মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৫১১০।

২২৬. মুসলিম, হাদীছ নং ১৪৭; মিশকাত, হাদীছ নং ৫১০৮।

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ إِيْمَانٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ مِّنْ كِبَرٍ.

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, ‘যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ ঈমান থাকবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না। পক্ষান্তরে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না’।^{২২৭} তিনি আরো বলেন,

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ فِي صُورَةِ الرِّجَالِ يَعْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، يُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ مِنْ جَهَنَّمَ يُسَمَّى بُؤْلَسَ، تَعْلُوهُمْ نَارُ الْأَنْيَارِ، وَيُسْفَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ طِينَةَ الْخَبَالِ.

আমর ইবনু শু‘আয়েব তার পিতার সূত্রে এবং তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, নবী (সঃ) বলেছেন, ‘অহংকারীরা ক্বিয়ামতের দিন মানুষরূপী পিপীলিকা সদৃশ হবে। লাঞ্ছনা ও অপমান চতুর্দিক থেকে তাদেরকে পরিবেষ্টিত করে রাখবে। তাদেরকে জাহান্নামের একটি কারাগারের দিকে তাড়িয়ে নেওয়া হবে, যার নাম বুলাস। তাদের জন্য জাহান্নামের লেলিহান অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত হবে এবং তাদেরকে জাহান্নামীদের দুর্গন্ধময় ঘাম ও বিষাক্ত পানীয় পান করতে দেওয়া হবে’।^{২২৮} রাসূলুল্লাহ (সঃ) আরো বলেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবগত করব না? তারা হল- অনর্থক কথা নিয়ে বিবাদকারী, বদ মেজাজী, অহংকারী’।^{২২৯}

দুনিয়াতেও স্বাভাবিক অবস্থায় অহংকারী ব্যক্তিকে মানুষ পসন্দ করে না। তাই ইহ ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে এই গর্হিত অভ্যাস থেকে প্রত্যেক

২২৭. মুসলিম, মিশকাত, বাংলা, হাদীছ নং ৪৮৮০।

২২৮. তিরমিযী, হাদীছ নং ২৪৯২; মিশকাত, হাদীছ নং ৫১১২; আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৫৫৭, হাদীছ হাসান।

২২৯. বুখারী, হাদীছ নং ৬০৭১, ‘শিষ্টাচার’ অধ্যায়, ‘অহংকার’ অনু.; মিশকাত, হাদীছ নং ৫১০৬।

মুমিনকে দূরে থাকা একান্ত জরুরী। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, **إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ**। নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা আমার নিকট এ মর্মে অহী করেছেন যে, তোমরা নম্র হও। কেউ কারো উপর গর্ব কর না।^{২৩০} সুতরাং পরকালীন জীবনে আল্লাহর সম্ভ্রুতি অর্জনের পাশাপাশি ইহকালীন জীবনে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রাখার স্বার্থে অহংকার থেকে মুক্ত থাকা প্রত্যেক মুমিনের ঈমানী দায়িত্ব।

১৭. মন্দ নামে ডাকা :

পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির একটি বড় বিষয় হল আন্তরিকতাপূর্ণ সম্বোধন। কারও সম্বোধনের ক্ষেত্রে কোন প্রকার ঘাটতি থাকলে পারস্পরিক হৃদয়তায় ঘাটতি ঘটে। সমাজে অনেককে দেখা যায়, কোন ব্যক্তি হয়তো কখনো কোন অন্যায় বা মন্দ কাজ করেছে, পরবর্তীতে তার নামের সাথে উক্ত অপকর্মের পরিচিতি উল্লেখ করে আগে বা পরে উপাধি (?) লাগান হয়। যা ঐ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই কষ্টদায়ক। কাউকে লাঞ্ছিত করা, হয়ে প্রতিপন্ন করা বা লজ্জা দেয়ার উদ্দেশ্যে এরূপ মন্দ নামে ডাকা ইসলামী শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। মহান আল্লাহ বলেন, **وَلَا تَنَابَرُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ** 'তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেক না; ঈমান আনার পরে কাউকে মন্দ নামে ডাকা পাপ'।^{২৩১} তাছাড়া আমি যেমন চাইব না যে, আমাকে কেউ মন্দ নামে সম্বোধন করুক। তাই অন্যের ক্ষেত্রেও নিজে সতর্ক থাকতে হবে। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীছটি স্মরণযোগ্য।

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ।

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, 'সেই মহান সন্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! কোন বান্দা পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না, যে পর্যন্ত সে কোন মুসলমান ভাইয়ের জন্য সেটা পসন্দ না করে, যা সে নিজের জন্য পসন্দ করে'।^{২৩২} অবশ্য হাদীছটি ব্যাপক অর্থবোধক। তাই শুধু কাউকে সম্বোধনের ক্ষেত্রে নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে অত্র হাদীছের অনুসরণ অতীব প্রয়োজন।

২৩০. ইবনু মাজাহ, হাদীছ নং ৪১৭৯; আব্দুদাউদ, হাদীছ নং ৪৯৫;

সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ নং ৫৭০, হাদীছ ছহীহ।

২৩১. সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১১।

২৩২. মুসলিম, হাদীছ নং ৭২।

ক্রোধ অত্যন্ত নিন্দনীয় আচরণ। কোন মানুষ যখন রাগান্বিত হয়ে উঠে, তখন তার আপাদমস্তক এমনকি শিরা-উপশিরায় এমন উত্তেজনা বিরাজ করে, যেন সে একটি জ্বলন্ত অগ্নিশিখা। এ কারণে রাগান্বিত অবস্থায় সে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে এবং ন্যায়-নীতির সীমা অতিক্রম করে ফেলে। এ কারণেই ইসলামী শরী'আত ক্রোধকে মন্দ স্বভাব বলে আখ্যায়িত করেছে। সৃষ্টির উপাদানগত বৈশিষ্ট্যের কারণে পরিবেশ-পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে মানব শরীরে রাগ আসবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু রাগ একটি ক্ষতিকর অভ্যাস, তাই একে সংবরণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত একটি হাদীছে জনৈক ব্যক্তির উপদেশ প্রার্থনায় রাসূল (সঃ) বলেছিলেন, لَا تَغْضَبْ 'তুমি রাগ কর না'। লোকটি কয়েকবার একই কথা জিজ্ঞেস করলে, রাসূল (সঃ) প্রত্যেকবার তাকে একই জবাব দিলেন যে, 'তুমি রাগ কর না'।^{২৩৩} ক্রোধ সংবরণ করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে অপেক্ষাকৃত কম শক্তিদ্বারা ব্যক্তিকে পরাভূত করা সম্ভব। কিন্তু আপন প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা অত সহজ কাজ নয়। আর এ কারণেই ক্রোধ সংবরণের বিষয়টি বীরত্বপূর্ণ কাজ হিসেবে রাসূল (সঃ) নিম্নের হাদীছে সুস্পষ্ট উল্লেখ করেছেন।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرْعَةِ، إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْعُصْبِ.

আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সঃ) বলেছেন, 'ঐ ব্যক্তি শক্তিশালী নয়, যে প্রতিপক্ষকে মোকাবেলায় পরাভূত করে। বস্ত্রত সেই প্রকৃত বীর, যে ক্রোধের সময় নিজেকে সংবরণ করতে পারে'।^{২৩৪}

আবু যার (রাঃ) বর্ণিত অপর এক হাদীছে ক্রোধ সংবরণের কৌশল হিসেবে বলা হয়েছে, إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنَّ ذَهَبَ عَنْهُ

২৩৯. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ ১৩২০; সিলসিলা ছহীহা, হাদীছ ১৩৭৫, ছহীহ বি-গায়রিহি।

১৯. সন্দেহযুক্ত আচরণ করা :

কোন মুমিন ব্যক্তির পক্ষে নিজ ভাই বা বন্ধুর সম্মুখে এমন কোন আচরণ করা ঠিক হবে না, যার ফলে তার মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। এ রকম আচরণ পারস্পরিক সম্পর্কে চিড় ধরায়। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছ প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كُتِمَ ثَلَاثَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الْآخَرِ حَتَّى تَحْتَطِلُوا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَحْزَنَهُ.

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'উদ (রাঃ) হতে বর্ণিত, নবী (সঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা তিন জন একত্রে থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দুই জনে চুপে চুপে কথা বলবে না; অন্যান্য লোকের সাথে মিলিত না হওয়া পর্যন্ত। এটি এজন্য যে, এ (আচরণ) তাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে পারে'। ২৪০

শুধু কানে কানে কথা বলাই নয়, বন্ধুর মনে সন্দেহ সৃষ্টি হতে পারে এরূপ সকল আচরণ ও কর্ম থেকে দূরে থাকা উচিত। বন্ধুর কোন আচার বা ব্যবহারের কারণে যদি অপর বন্ধুর মনে সন্দেহের উদ্বেক হয়, তাহলে উভয়ের মধ্যে হৃদযত্নার ঘাটতি ঘটে। যেহেতু সন্দেহের বিষয়টি সর্বদা অস্পষ্ট থাকে, তাই এর কারণে সম্পর্কের ঘাটতি ঘটলে তা সহজে স্বাভাবিক হয় না। তাই প্রত্যেকের উচিত যে কোন সন্দেহযুক্ত কর্ম ও আচরণ থেকে নিজেকে বিরত রাখা।

২০. গালি দেওয়া :

গালিগালাজ অত্যন্ত গর্হিত আচরণ। মুসলমান গালিগালাজ প্রদানকারী হতে পারে না। মুমিনের যবান সংযত থাকা একান্ত কাম্য। অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করে পরিবেশ দূষিত করা তার জন্য শোভা পায় না। আচার-ব্যবহার ও ভাষার সৌন্দর্য পারস্পরিক বন্ধুত্ব সৃষ্টি ও তা স্থায়ীকরণে মুখ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অপর পক্ষে গাল-মন্দের মাধ্যমে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক তথা ভ্রাতৃত্ববোধের ঘাটতি ঘটে। আর গাল-মন্দকারীকে কেউ পসন্দকরে না। গালির ক্ষেত্রে শারয়ী বিধান সুস্পষ্ট। যেমন-

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يَضْمَنْ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ.

সাহল ইবনে সা'দ (রাযিরাহুত্বাহু) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়াল ও দুই পায়ে মধ্যস্থিত বস্তুর যিম্মাদার হবে, আমি তার জন্য বেহেশতের যিম্মাদার হব'।^{২৪১} অত্র হাদীছে দুই চোয়ালের মধ্যস্থিত বস্তু বলতে মূলত জিহ্বাকে বুঝানো হয়েছে; গাল-মন্দ করার ক্ষেত্রে যার ব্যবহারিক ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিরাহুত্বাহু) হতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, سِبَابُ الْمُسْلِمِ كَغَالِي دِيَارِ فَاسَ كَقَتْلِهِ وَكُفْرُ كُفْرَى।^{২৪২}

আবু হুরায়রা (রাযিরাহুত্বাহু) হতে বর্ণিত এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আরো বলেন, الْمُسْتَبَانُ مَا قَالَا فَعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَالٌ يَعْتَدِ الْمَظْلُومُ. 'মায়লুম যদি সীমালংঘন না করে তাহলে দু'জন গালিগালাজকারী ব্যক্তির মধ্যে প্রথম যে সূচনাকারী তার উপর উভয়ের পাপ বর্তাবে'।^{২৪৩} ইয়ায ইবনে হিমার (রাযিরাহুত্বাহু) হতে বর্ণিত আরেকটি হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, الْمُسْتَبَانُ 'যারা একে অপরকে গালি দেয় তারা شَيْطَانَانِ يَتَهَاتَرَانِ, وَيَتَكَذَّبَانِ. 'উভয়েই শয়তান। উভয়েই কটু কথা বলে এবং উভয়েই মিথ্যুক'।^{২৪৪}

উপরের আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, গালি দেওয়া অত্যন্ত ঘৃণ্য অভ্যাস। এর মাধ্যমে পারস্পরিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হয়। ইহ ও পরকালে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পক্ষান্তরে যদি অন্যায়ভাবে কেউ যদি কাউকে গালি দেয়, সে ক্ষেত্রে ধৈর্য ধারণ করাই উত্তম। এ প্রসঙ্গে নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا شَتَمَ أَبَا بَكْرٍ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْجَبُ وَيَتَسَمُّ فَلَمَّا أَكْثَرَ رَدَّ عَلَيْهِ بَعْضَ قَوْلِهِ فَقَضَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَامَ فَلَحِقَهُ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ

২৪১. বুখারী, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৬০২।

২৪২. বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদীছ নং ৪৮১৪।

২৪৩. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৪২৫; তিরমিযী, হাদীছ নং ১১৮১, হাদীছ হযীহ।

২৪৪. আল-আদাবুল মুফরাদ, হাদীছ নং ৪২৭; আত-তা'লীকুর রাগীব ৩/২৮৫, হাদীছ হযীহ।

হচ্ছে'।^{২৪৬} পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রিক তথা জীবনের যে কোন ক্ষেত্রে যখন কারো দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ হয়, তখন ঐ সমাজের লোক তাকে আর বিশ্বাস করতে পারে না। ফলে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে চরম ঘাটতি ঘটে। তাই প্রত্যেকের উচিত নিরপেক্ষভাবে কাজ করা। এর দ্বারা মানুষের আস্থা অর্জিত হয়, সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ আরো সুসংহত হয়।

মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দু'একটি অবিস্মরণীয় নিদর্শন

মহানবী (ﷺ)-এর নবুয়াতী জীবন দুই ভাগে বিভক্ত। মাক্কী জীবন ও মাদানী জীবন। মক্কা তাঁর জন্মভূমি, মাতৃভূমি। সেখানেই তিনি জীবনের সিংহভাগ সময় অতিবাহিত করেছেন। তার পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-সজন, ঘর-বাড়ি, সহায়-সম্মল সবই মক্কায়ে। কিন্তু নবুয়াতী জীবনের এক চরম সন্ধিক্ষণে মহান আল্লাহর নির্দেশে তাঁকে প্রাণপ্রিয় মাতৃভূমি মক্কা ছেড়ে মদীনায় হিজরত করতে হয়। এ নির্দেশ শুধু তাঁর একার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না, বরং তৎকালীন মক্কার সকল মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য ছিল। তাই আত্মীয়-সজন, ধন-সম্পদ, ঘর-বাড়ি সব ছেড়ে পর্যায়ক্রমে মক্কার সকল মুসলমান মদীনায় হিজরত করেন। অনেকে সন্তান-সন্ততি, স্ত্রী-পরিজনও মক্কায়ে রেখে আসেন।

এদিকে মুসলমানদের ফেলে যাওয়া ঘর-বাড়ি, ধনসম্পদ সবই মক্কার মুশরিকরা অন্যায়ভাবে নিজেদের অধিকারভুক্ত করে নেয়। এহেন নাযুক পরিস্থিতিতে এই সহায়-সম্মলহীন নিঃস্ব নিরীহ মুসলমানরা মদীনায় এসে থাকবে কোথায়, আর খাবেই বা কি? দীর্ঘ বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে মহানবী (ﷺ) যখন মদীনায় এসে পৌঁছেন, তখন তিনি আবু আইউব আনসারীর বাড়িতে উঠেন। অতঃপর আনহার ও মুহাজিরগণের স্বতঃস্ফূর্ত শ্রম ও সহযোগিতায় মসজিদে নববী তৈরির পর তারই পাশে কতগুলো ঘর তৈরি করা হয়। এর পর থেকে আবু আইউব আনসারীর বাড়ি থেকে তিনি আপন পত্নীগণের নিয়ে ঐ ঘরে বসবাস করতে থাকেন। কিন্তু তাঁর সাহাবারা কে কোথায় থাকবেন? মসজিদে নববী তৈরির সময় আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া, সাহায্য সহযোগিতা এবং উৎসাহ-উদ্দীপনার এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছিল। মানব জাতির ইতিহাসে যার তুলনা মেলা ভার। তারই ধারাবাহিকতায় রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনাস বিন মালেকের গৃহে মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন সুদৃঢ় করার লক্ষ্যে

পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে। পালকদের একজনকে রক্ষণ করবে।

একত্রিত হলেন। উক্ত সভায় সেদিন সর্বমোট নব্বই জন মুসলমান উপস্থিত ছিল। যার অর্ধেক ছিল আনসার এবং অর্ধেক ছিল মুহাজির। যে বৈঠক ‘আনসার ও মুহাজিরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন’ নামে সুপ্রসিদ্ধ।

উক্ত বৈঠকে রাসূলুল্লাহ (ﷺ) আনসার ও মুহাজিরদের মধ্যে ‘ইসলামী ভ্রাতৃত্বের’ (المواخاة الإسلامية) বন্ধন স্থাপন করেন এই শর্তে যে, ‘তারা পরস্পরের দুঃখ-বেদনার সাথী হবেন এবং মৃত্যুর পরে পরস্পরের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হবেন’। তবে উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি দ্বিতীয় হিজরীতে সংঘটিত বদর যুদ্ধের পর অবতীর্ণ নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে রহিত হয়ে যায়। যেখানে বলা হয়, وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ

‘বংশ সম্পর্কীয় আত্মীয়গণ পরস্পরের অধিক হকদার আল্লাহর কিতাবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বিষয়ে অধিক জ্ঞাত’।^{২৪৭} উত্তরাধিকার লাভের বিষয়টি রহিত হলেও তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন ছিল অটুট এবং অনন্য। বিশ্ব ইতিহাসে এইরূপ নিঃস্বার্থ ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের কোন তুলনা নেই। যেমন-

১. আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ : রাসূলুল্লাহ (ﷺ) মুহাজির আব্দুর রহমান বিন আওফকে আনছার সা‘দ বিন রাবী-এর সাথে ভ্রাতৃত্ব বন্ধন স্থাপন করে দেন। অতঃপর সা‘দ তার মুহাজির ভাইকে বললেন, ‘আনছারদের মধ্যে আমি সর্বাপেক্ষা ধনী। আপনি আমার সম্পদের অর্ধেক গ্রহণ করুন এবং আমার দু’জন স্ত্রীর মধ্যে যাকে আপনি পসন্দ করেন বলুন, তাকে আমি তালাক দিয়ে দিব। ইদত শেষে আপনি তাকে বিবাহ করবেন’। আব্দুর রহমান বিন ‘আওফ তার আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয়ে তাকে দো‘আ করলেন, بَارَكَ اللَّهُ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ ‘আল্লাহ আপনার পরিবারে ও ধন-সম্পদে বরকত দান করুন’! আপনি আমাকে আপনাদের বাজার দেখিয়ে দিন। অতঃপর তাঁকে বনু ক্বায়নুকা-র বাজার দেখিয়ে দেওয়া হল। তিনি সেখানে গিয়ে পনীর ও ঘি-এর ব্যবসা শুরু করলেন এবং কিছু দিনের মধ্যে সচ্ছলতা লাভ করলেন। এক সময় তিনি বিয়ে-শাদীও করলেন।^{২৪৮}

২. খেজুর বাগান ভাগ করে দেওয়ার প্রস্তাব : আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আনছারগণ একদিন রাসূলের (ﷺ) কাছে এসে নিবেদন করল যে, আপনি আমাদের খেজুর বাগানগুলো আমাদের ও মুহাজির ভাইগণের মধ্যে সমান ভাবে বন্টন করে দিন’। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

২৪৭. সূরা আনফাল, আয়াত ৭৫।

২৪৮. বুখারী, হাদীছ নং ৩৭৮০-৮১ ‘ছাহাবীগণের মর্যাদা’ অধ্যায় অনুচ্ছেদ-৩০ ও হাদীছ নং ২৬৩০, ‘হেবা’ অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৩৫।

তখন তারা বলল যে, তবে এমন করুন যে, মুহাজির ভাইগণ আমাদের কাজ করে দেবেন এবং আমরা ফলের অংশ দিব'। রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এতে সম্মত হলেন।^{২৪৯}

৩. জমি বন্টনের প্রস্তাব : বাহরায়েন এলাকা বিজিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এখানকার পতিত জমিগুলো আনহারদের অনুকূলে বরাদ্দ দিতে চাইলে তারা আপত্তি করে বলল, আমাদের মুহাজির ভাইদের উক্ত পরিমাণ জমি বরাদ্দ দেওয়ার পরে আমাদের দিবেন। তার পূর্বে নয়।^{২৫০}

এ সব ঘটনা থেকে বুঝা যায় যে, সর্বাস্বান্ত মুহাজির ভাইদের জন্য আনহারগণের সহমর্মিতা কত গভীর ছিল। মূলতঃ তাদের ভ্রাতৃত্ব বন্ধন ছিল তাকওয়া বা আল্লাহুভীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত। যার মাধ্যমে বংশ, বর্ণ, অঞ্চল, ভাষা প্রভৃতি আরবের চিরাচরিত বন্ধন সমূহের উপরে তাওহীদ ও আখেরাত ভিত্তিক নবতর এক অটুট জাতীয়তার বন্ধন স্থাপিত হয়। যা পরবর্তীতে ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার জন্ম দেয় এবং প্রতিষ্ঠিত হয় আল্লাহর গোলামীর অধীনে সকল মানুষের সমানাধিকার ভিত্তিক ইসলামী খেলাফতের দৃঢ় ভিত্তি। বর্ণিত হয় এক অসাম্প্রদায়িক ও উদারনৈতিক ইসলামী সমাজের বীজ। 'আল্লাহর দাসত্বের অধীনে সকল মানুষের অধিকার সমান'- এই মহান সাম্যের বাণী ও তার বাস্তব প্রতিফলন দেখে আজীবন দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ ময়লুম জনতা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে চরমভাবে নিগৃহীত ও শোষিত মানবতা যেন হাফ ছেড়ে বাঁচে। জান্নাত লাভের প্রতিযোগিতায় সর্বোত্তমরূপে বিকশিত মানবতা মদীনার আদি বাসিন্দাদের চমকিত করল। যা তাদের স্বার্থান্বেষী জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নোংরা দুনিয়াপূজা হতে মুখ ফিরিয়ে আখেরাতমুখী মানুষের বিজয় মিছিল এগিয়ে চলল। কাফির-মুশরিক, ইহুদী-নাছারা ও মুনাফিকদের যাবতীয় চেষ্টাকে নস্যাৎ করে দিয়ে প্রতিষ্ঠা লাভ করল বিশ্বজয়ী ইসলামী খেলাফত। যা কয়েক বছরের মধ্যেই তৎকালীন বিশ্বের সকল পরাশক্তিকে দমিত করে অপরাজেয় বিশ্বশক্তিরূপে আবির্ভূত হল।

বস্তুতঃ আনহার ও মুহাজিরগণের মধ্যে যদি এইরূপ নিখাদ ঐক্য সৃষ্টি না হত এবং স্থানীয় ও বহিরাগত দ্বন্দের ফাটল দেখা দিত, তাহলে মদীনায় মুসলমানদের উঠতি শক্তি অংকুরেই বিনষ্ট হয়ে যেত। পরিণামে তাদেরকে চিরকাল ইহুদীদের শোষণের যাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হতে হত। যেভাবে ইতিপূর্বে মক্কায় কুরায়েশ নেতাদের হাতে তারা পর্যুদস্ত হয়েছিল।

২৪৯. বুখারী, হাদীছ নং ৩৭৮২।

২৫০. বুখারী, হাদীছ নং ১১৫৮, বজানুবাদ হাদীছ নং ৫/২৪১।

যুদ্ধ শুরু হল এবং প্রচণ্ড আকার ধারণ করল। যুদ্ধের সময় হ্যায়ফা (পরিমার্জিত) আহতদের মধ্যে তার চাচাতো ভাইকে খুঁজতে শুরু করলেন। তার সাথে ছিল সামান্য পানি। হ্যায়ফার চাচাতো ভাইয়ের শরীর দিয়ে রক্ত ঝরছিল। তার অবস্থা ছিল আশংকাজনক। হ্যায়ফা তাকে বললেন, তুমি কি পানি পান করবে? সে তার কথার কোন উত্তর দিতে সক্ষম না হয়ে হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত করল। আহত ব্যক্তি হ্যায়ফার নিকট থেকে পানি পান করার জন্য হাতে নিতেই তার পাশে এক সৈন্যকে পানি পানি বলে চিৎকার করতে শুনল। পিপাসার্ত ঐ সৈনিকের বুকফাটা আর্তনাদ শুনে তার পূর্বে তাকে পানি পান করানোর জন্য হ্যায়ফাকে ইঙ্গিত করল। হ্যায়ফা তার নিকট গিয়ে বললেন, আপনি কি পানি পান করতে চান? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তিনি পান করার জন্য পাত্র উপরে তুলে ধরতেই পানির জন্য অন্য একজন সৈন্যের চিৎকার শুনে পেলেন। তিনি পানি পান না করে হ্যায়ফাকে বললেন, তার দিকে দ্রুত ছুটে যাও এবং সে পানি পান করার পর কিছু পানি অবশিষ্ট থাকলে আমাকে দিয়ো। হ্যায়ফা আহত সৈন্যটির নিকটে গিয়ে দেখলেন, সে মারা গেছে। অতঃপর দ্বিতীয় জনের কাছে এসে দেখলেন সেও মারা গেছে। অতঃপর চাচাতো ভাইয়ের কাছে ফিরে আসলে দেখেন তিনিও শাহাদাতের অমীয় সুখা পান করে জান্নাতবাসী হয়েছেন। পানির পাত্রটি তখনও হ্যায়ফার হাতে। এতটুকু পানি। অথচ তা পান করার মত এখন

আর কেউ বেঁচে নেই। যাদের পানির প্রয়োজন ছিল তারা আরেক জনের পানির পিপাসা মেটাবার জন্য এতই পাগলপারা ছিলেন যে, অবশেষে কেউ সে পানি পান করতে পারেননি।^{২৫১} এটাই সত্যিকারের ভ্রাতৃত্ব।

এমন অসংখ্য অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন মহানবীর আদর্শের অনুসারী সাহাবায়ে কেরাম এবং পরবর্তী জান্নাতের পাগল মুসলমানরা। আজও যদি মানবীয় পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি করা যায়, তবে সমাজের সকল অশান্তি দূর করা সম্ভব।

□ উপসংহার :

পৃথিবীর সকল বনু আদম মূলতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; মুসলিম ও অমুসলিম। ইসলাম মুসলমানদের ধর্ম হলেও ইসলামের বিধান শুধুমাত্র মুসলমানদের জন্য নয়, সকল মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ যেমন আলো-বাতাস, খাদ্য-পানিতে মুসলিম-অমুসলিমে বেশ-কম করেন না। তদ্রূপ একজন মানুষ আরেকজন মানুষের সাথে মৌলিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় জাতি, ধর্ম বা বর্ণের কোন বাহ-বিচার করা উচিত নয়। অর্থাৎ আদম সন্তান হিসেবে মানুষে মানুষে কোন ভেদাভেদ নেই। এই মহান সত্য বিষয়টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-এর জীবনে। ধর্মীয় আবেগ কিংবা পুঁথিগত বিশ্বাসের বিচারে নয়; বরং সংঘটিত ঘটনাবলী, বিজ্ঞানধর্মী নিরপেক্ষ পর্যালোচনা ও ঐতিহাসিক ফলাফলের আলোকে একথা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত যে, হযরত মুহাম্মাদ (ﷺ)-ই সকল যুগের, সকল কালের, সকল দেশের, সকল শ্রেণী সকল মানুষের জন্য একমাত্র অনুসরণীয় পরিপূর্ণ জীবনাদর্শ। তাই যে কোন ধর্মের, চিন্তার ও মতাদর্শের যে কোন ব্যক্তি পক্ষপাতমুক্ত মানসিকতায় অবশ্যই স্বীকার করবেন যে, মানুষ হিসেবে মুহাম্মাদ (ﷺ) অবশ্যই পৃথিবীর সকল মানুষের সর্বোচ্চ গ্রহণযোগ্য আদর্শ ব্যক্তি। মহান আল্লাহ বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য রাসূল (ﷺ)-এর মধ্যেই রয়েছে অনুপম অনুসরণীয় আদর্শ'।^{২৫২} আল্লাহর বিধান ও রাসূল (ﷺ)-এর আদর্শ বিমুখতার কারণে বিশ্বমানবতা আজ পদে পদে লঙ্ঘিত ও অপমানিত হচ্ছে।

বর্তমানে ভারতবর্ষসহ বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে শুধুমাত্র ধর্মের পরিচয়ে মানুষ মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে খুন করছে। ধর্মের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনের মানসে এক শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানও এই ভ্রান্ত পথে পা বাড়িয়েছে। অথচ

২৫১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়াহ, কায়রো, ১৯৮৮, ৭/৮-১১ প্রভৃতি।

২৫২. সূরা আল-আহযাব, আয়াত ২১।

ইসলামে নরহত্যা জঘন্যতম অপরাধ হিসেবে বিবেচিত। যদিও একজন মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের কিছু বাড়তি দায়িত্ব আছে; তথাপি কারো ন্যায় অধিকার খর্ব করে অন্যের উপকার করা ইসলামী নীতি নয়। বরং প্রত্যেক বনু আদমের মানবীয় অধিকার আদায়ে সচেষ্ট থাকাই ইসলামী নীতি। আর এটাই মানবীয় ভ্রাতৃত্ব, জাতিগত ভ্রাতৃত্ব বা বিশ্বভ্রাতৃত্ব।

ইসলামী ভ্রাতৃত্বও মূলতঃ সার্বজনীন ভ্রাতৃত্ব। কারণ বিশ্বভ্রাতৃত্বে একজন মানুষ অপর মানুষের প্রতি মানুষ হিসেবে শোভন ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলে। কিন্তু ইসলামী ভ্রাতৃত্বে নিজ ধর্মের বিধান পরিপালনের খাতিরেই একজন মুসলমান কি মুসলিম কি অমুসলিম সকলের সাথে সুসম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলে। তাই বলা চলে বিশ্বভ্রাতৃত্ব ইসলামী ভ্রাতৃত্বের একটি অংশমাত্র। মূলতঃ ইসলামী ভ্রাতৃত্বই প্রকৃত এবং পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ব।

ইসলামী আন্দোলনে নেতা-কর্মীর সম্পর্ক হবে সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ়। ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধের চেতনায় তারা সর্বদা উজ্জীবিত থাকবে। হিংসা-বিদ্বেষ ও পরশ্রীকাতরতা থেকে তারা যোজন যোজন দূরে অবস্থান করবে। অন্যথা আন্দোলন তার কাজিত লক্ষ্যে পৌছতে ব্যর্থ হবে। কোন আন্দোলন বা সমাজের মানুষ যদি ভ্রাতৃত্ব নষ্টের কারণগুলোর দিকে লক্ষ্য করে ভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধির উপায়গুলো যথাযথভাবে অনুসরণ করে চলে, তাহলে উক্ত সমাজ যে শান্তিপূর্ণ সমাজে রূপলাভ করবে তাতে কোনই সন্দেহ নেই। সাথে সাথে কারো সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন বা শত্রুতার ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই সীমালঙ্ঘন করা ঠিক হবে না। আলী (রাঃ) উবনুল কাওয়াকে লক্ষ্য করে বলেন,

هَلْ تَذَرِي مَا قَالَ الْأَوَّلُ؟ أَحَبُّ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ
يَوْمًا مَّا وَأَبْغَضُ بَغِيضِكَ هَوْنًا مَّا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَّا.

‘প্রবীণরা কি বলেছেন জান? তোমরা বন্ধুর প্রতি বন্ধুত্ব প্রদর্শন করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কাল হয়ত সে তোমার শত্রুতে পরিণত হবে। আর তোমরা শত্রুর প্রতি শত্রুতা পোষণ করতেও সীমার মধ্যে থাকবে। কাল সে তোমার বন্ধুতেও পরিণত হবে’।^{২৫৩}

মহান আল্লাহ সকলকে শারঈ বিধান মোতাবেক সকলের সাথে বন্ধুত্ব সৃষ্টির মাধ্যমে দুনিয়াবী জীবনে শান্তি এবং পরকালীন জীবনে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের তাওফীক দান করুন। আমীন॥

হে মানবমণ্ডলী! সাবধান, নিশ্চয়ই তোমাদের সকলের
প্রভু এক। অতএব অনারবীর উপর আরবের, আরবীর
উপর অনারবের, লালের উপরে কালের এবং কালের
উপরে লালের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই, তাকুওয়া ব্যতীত।
প্রত্যেক মানুষ আদম সন্তান, আর আদম মাটির তৈরি।

-হযরত মুহাম্মাদ (ছা.)

আকৃতির দিক দিয়ে সকল মানুষ সমান। তাদের সকলের
পিতা আদম ও মাতা হাওয়া। একটি প্রাণ আরেকটি
প্রাণের ন্যায় এবং তাদের রূহগুলো পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ।
প্রত্যেকের দেহ হাড়ি দ্বারা তৈরি, আর তাতে রয়েছে
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। যদি মৌলিকভাবে তাদের মধ্যে গর্ব করার
মত কিছু থাকে, তবে তা হল মাটি ও পানি।

-হযরত আলী (রা.)

গাহি সাম্যের গান-

মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান!
নাই দেশ-কাল-পাত্রের ভেদ, অভেদ ধর্ম জাতি,
সব দেশে, সব কালে, ঘরে ঘরে তিনি মানুষের জ্ঞাতি।
-বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম



ইসলামী আন্দোলনে
দ্রাব্য
ড. এএসএম আমী...
53654#1458411-1
R



শ্যামলবাংলা একাডেমী, রাজশাহী